সিদ্ধিজ্যোতি

২০২৪

সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়

শ্যামসুন্দরপুর পাটনা • পাঁশকুড়া • পূর্ব মেদিনীপুর • পিন - ৭২১১৩৯
ফোন - ০৩২২৮ - ২৫৫০৩০
email - Siddhinathmahavidyalaya@gmail.com

সিদ্ধিজ্যোতি

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা

২০২৪

সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়

শ্যামসুন্দরপুর পাটনা • পূর্ব মেদিনীপুর • পিন - ৭২১১৩৯

মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা - **ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম যুগ্মসংখ্যা**

সিদ্ধিজ্যোতি

সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের মুখপত্র

প্রকাশক ঃ

ড. উমা ঘোষ,
অধ্যক্ষা, সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়।

প্রকাশ কাল - ৫ জুন, ২০২৪ (বিশ্ব পরিবেশ দিবস)

পত্রিকা কমিটি যুগ্মসম্পাদক ঃ

অধ্যাপিকা ড.শ্যামশ্রী সুর, বিভাগীয় প্রধান, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ।
অধ্যাপক আবুকালাম অলবিরুনি, বিভাগীয় প্রধান, ভূগোল বিভাগ।

পত্রিকা কমিটি ঃ

নমিতা মাইতি , সঙ্গীতা সাহু, অনুশ্রী মাইতি, মৃন্ময় মুখার্জি, সঞ্জীব দোলই, অর্পিতা চক্রবর্তী, তারকনাথ দোলই, শান্তিগোপাল মাইতি, পলাশ ভুঞ্যা, কৃষ্ণপদ পাল।

প্রচ্ছদ ঃ সঞ্জীব দোলই, রাসবিহারী কর।

কম্পিউটার গ্রাফিক্স ও মুদ্রণে ঃ

প্রিন্ট ওয়ার্ল্ড, মনসাপুকুর হাট / কেশাপাট
মোঃ ৯৯৩২৩৩৮৪৬৪

উৎসর্গ

মহামারীতে স্বজনহারা বিশ্ববাসীকে

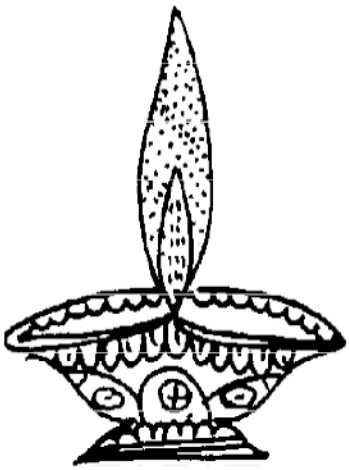

Professor Susanta Kumar Chakraborty
Vice-Chancellor
Vidyasagar University
Midnapore - 721102
West Bengal, India

VIDYASAGAR UNIVERSITY
MIDNAPORE - 721102

Website : www.vidyasaga
E-
vcconfidential@mail.vidyasaga
vc@mail.vidyasaga
susantachakrabortyzoology@gma
susantachakraborty@yaho
Mobile : 943327059 / 97489
Telefax : (03222) 2

Date: 22.04.2024

MESSAGE

It is heartening to note that *Siddhijyoti*, the College Magazine of Siddhinath Mahavidyalaya, Purba Medinipur is going to be published on the occasion of World Environment Day on June 5, 2024. I hope that the magazine will reflect an uncommonly good taste as before.

I commend the endeavours of all concerned who have worked with passion and commitment to bring out the magazine.

I extend my greetings and good wishes on the occasion.

(Professor Susanta Kumar Chakraborty)

Dr. Uma Ghosh,
Principal,
Siddhinath Mahavidyalaya,
Shyamsundarpur Patna,
Panskura,
Purba Medinipur – 721 139

VIDYASAGAR UNIVERSITY, MIDNAPORE
OFFICE OF THE INSPECTOR OF COLLEGES
P.O.: VIDYASAGAR UNIVERSITY, PASCHIM MEDINIPUR- 721102

Ref.No. VU/IC/Misc/112/2024 Date : April 19, 2024

To : The Principal,
Siddhinath Mahavidyalaya,
Shyamsundarpur Patna,
Panskura, Purba Medinipur.

Dear Madam,

It is definitely a matter of immense pleasure to learn that Siddhinath Mahavidyalaya is going to publish 'SIDDHIJYOTI' on 5th June 2024, to commemorate the noble occasion of the World Environment Day.

I sincerely wish my best for the success of the commemorative volume and wish that it will be inspiring and will be able to create a substantial impression on one and all.

Yours sincerely,

(DR. AVIJIT ROYCHOUDHURY)
INSPECTOR OF COLLEGES
Inspector of Colleges,
Vidyasagar University
Midnapore-721102

সূচীপত্র

নং	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা নং
১।	অধ্যক্ষা মহাশয়ার কলমে		১
২।	পত্রিকা সম্পাদকের কলমে		২
৩।	সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়	শর্মিষ্ঠা করণ	৩
৪।	ধান কাটা	সৌমেন রানা	৩
৫।	আমি হব একজন ডাক্তার	শুভজিৎ মান্না	৪
৬।	নারী	প্রিয়াঙ্কা ঘোষ	৪
৭।	আমার মা	প্রভাতি ঘড়া	৪
৮।	বন্ধু	জোৎস্না ভুঞ্যা	৫
৯।	অদ্ভুত সমাজ	কাকলি ভুঞ্যা	৫
১০।	My Little Sister	Pallab Guchhait	৬
১১।	Studying	Antara Dolai	৬
১২।	পড়ার যন্ত্রনা	সন্তু কুইল্যা	৬
১৩।	স্কুল জীবনের শেষ দিনের কবিতা	বনশ্রী জানা	৭
১৪।	ওজন বুঝে ভোজন করো	মিতালী পাঁজা	৭
১৫।	প্লে গ্রাউন্ড VS ব্যাটল গ্রাউন্ড	সমীর ভুঞ্যা	৮
১৬।	ইচ্ছেডানা	শ্রাবনী হেম্ব্রম	৮
১৭।	প্রথম কবিতা	শ্রীতমা বিশ্রাম	৯
১৮।	স্বপ্নময় জীবন	রিনু প্রামানিক	৯
১৯।	কলেজ জীবন	শিউলি পাল	৯
২০।	অভিমান	অনিন্দিতা মন্ডল	১০
২১।	স্বামী বিবেকানন্দ	পিয়ালী জানা	১০
২২।	খাতার গুন	মধুমিতা মান্না	১০
২৩।	ফ্যাকাশে	শিউলি পাল	১১
২৪।	মা সরস্বতী	মৌসুমী পাত্র	১১
২৫।	আহ্বান	পূজা বেরা	১২
২৬।	অভিমানী মন	মৌসুমী মন্ডল	১২
২৭।	কল্পনা	মণিকা মান্না	১২
২৮।	হে নরেন্দ্রনাথ	ইপ্সিতা মেট্যা	১৩
২৯।	মেয়েদের সম্মান	মধুমিতা মান্না	১৩
৩০।	স্বপ্নের সন্ধানে	ছন্দা মন্ডল	১৪

নং	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা নং
৩১।	স্বপ্ন	রিয়া বেরা	১৪
৩২।	প্রথম বৃষ্টি	লিপিলেখা শাসমল	১৪
৩৩।	উন্মাদ	মানসী মাইতি	১৫
৩৪।	মুঠো ফোন	রিনু প্রামানিক	১৫
৩৫।	প্রিয় বন্ধু	মাম্পি খাটুয়া	১৫
৩৬।	সর্বশিক্ষা	শুভ রায়	১৫
৩৭।	আগমনী	লাবনী মাইতি	১৬
৩৮।	গাছ আমার বন্ধু	সোনালী কাজলী	১৬
৩৯।	শহীদ		১৭
৪০।	শূন্য	মৃণ্ময়ী গোস্বামী	১৭
৪১।	ও পাখি	সুরেশ দোলই	১৭
৪২।	আমি	তনয়া বর	১৮
৪৩।	ছেঁড়া কবিতার পাতা	রিমি পোড়্যা	১৮
৪৪।	উঠবে ভেসে	অমৃতা রায়	১৯
৪৫।	আমার মা	সুমনা জানা	১৯
৪৬।	ঋতু পরিবার	মৌমিতা পাঁঞ্জা	১৯
৪৭।	জীবনের অঙ্গীকার	বনশ্রী মাইতি	২০
৪৮।	সাঁঝবাতি রূপ কথা	তনয়া বর	২০
৪৯।	Doubt : A Deadly Disease	Mrinmoy Mukherjee	২১
৫০।	সত্য মানুষ	মধুমিতা ভুঞ্যা	২১
৫১।	EDUCATION	Digbejoy Acharya	২১
৫২।	দুঃখ	রশ্মি খাতুন	২২
৫৩।	স্মৃতি কথা	তাঞ্জিলা খাতুন	২২
৫৪।	যোগ পরিচয়	ড. প্রশান্ত কুমার ভুঞ্যা	২৩-২৪
৫৫।	শহিদ স্মরণে	অজয় দোলাই	২৪
৫৬।	Love in winter	Sarmila Pal	২৫
৫৭।	স্বাধীনতা	মৃন্ময় মুখার্জী	২৬
৫৮।	চিঠি	তারকনাথ দোলই	২৭
৫৯।	দুরাশা	সঙ্গীতা সাহু	২৭
৬০।	মোগলমারির ইতিহাস	সুপ্রিতি মাইতি	২৮-২৯
৬১।	ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেবী বর্গভীমা	অমৃতা মহাপাত্র	৩০-৩২
৬২।	একটি বৃষ্টির দিনের অভিজ্ঞতা	রিম্পা শাসমল	৩৩

নং	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা নং
৬৩।	ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	মিতালী পাঁজা	৩৪
৬৪।	পাথরা	মিতা জানা	৩৫-৩৬
৬৫।	পান্ডুরাজার ঢিবি	মিতা সাউ	৩৭-৩৮
৬৬।	চিত্ত বিনোদনে কালিম্পং যাত্রা	নিকিতা জানা	৩৯-৪০
৬৭।	প্রত্যন্ত গ্রামের বুকে উচ্চশিক্ষার বাহন হিসেবে সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়	বিশ্বজিৎ দাস	৪০
৬৮।	স্মৃতির ডায়রির পাতায়	রাধারাণী আদক	৪১-৪২
৬৯।	একটি ব্যতিক্রমী শহর চন্দননগর	সৌমেন দোলই	৪৩
৭০।	ইতিহাসের কারাগার জিনজিরা প্রাসাদ	অমিত মান্না	৪৪
৭১।	কর্মই ধর্ম	পলাশ ভূঞ্যা	৪৫-৪৮
৭২।	ভারতীয় চিন্তাধারায় জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ	আনন্দ পাহাড়ী	৪৯-৫২
৭৩।	পড়াশোনার সেকাল ও একাল	কৃষ্ণপদ পাল	৫৩-৫৫
৭৪।	মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় মাটি ও মানুষের কথা	অনুশ্রী মাইতি দাস পাত্র	৫৬-৫৮
৭৫।	রাজরোষে যুগান্তর	তন্ময় রায়	৫৯-৬১
৭৬।	যিশুর জন্মদিন এবং কিছু কথা	ড. প্রসেনজিৎ নায়েক	৬২
৭৭।	Uplifting of Dalit And Dr. Ambedkar	Sanjib Dolai	৬৩
৭৮।	মানসিক চাপ ও তার সমাধান	পামেলী মন্ডল	৬৪-৬৫
৭৯।	যোগঃ মহাশ্বেতা ও পার্বতী	তর্পিতা চক্রবর্তী	৬৬-৬৭
৮০।	সংকট থেকে সংকটোত্তরণ ঃ প্রেক্ষিত সুবোধ ঘোষের গল্প	নমিতা মাইতি	৬৮-৭১
৮১।	অবসাদ ঃ এক মানসিক ব্যাধি	ড. শ্যামশ্রী সুর	৭২-৭৪
৮২।	ডাক্তার বিদ্যাসাগর	দেবব্রত কবি	৭৫-৭৭
৮৩।	বর্তমান যুবসমাজ	বিপ্লব পাহাড়ী	৭৮-৮০
৮৪।	জল সংরক্ষণ	শুভজিৎ সামন্ত	৮১-৮২

অধ্যক্ষা মহাশয়ার কলমে

বিগত বছরগুলির ন্যায় এই বছরও আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা 'সিদ্ধিজ্যোতি' র প্রকাশে আমরা ব্রতী হয়েছি। 'সিদ্ধিজ্যোতি' একটি সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক মননশীল পত্রিকা যার পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালে। করোনা মহামারীর কারণে ২০২০ - ২০২১ এবং ২০২১ - ২০২২ আমরা পত্রিকা প্রকাশ করতে পারিনি। তাই যুগ্ম সংখ্যা এবং ২০২৩ - ২০২৪ এর জন্য মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষাকর্মী বৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় 'সিদ্ধিজ্যোতি'র প্রকাশ ঘটল নব ভাবনার আলোকে। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি নিভৃত পরিসরে তাদের মনের অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করার সুযোগ পায় এই পত্রিকার মাধ্যমে। তাদের নিজেদের পাশাপাশি আমরাও গর্বিত ও আনন্দিত। পত্রিকা নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের এক অনন্য মাধ্যম যেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের রচনার মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটে যথেষ্ট মাত্রায়। ফলে প্রজ্ঞা ও প্রতিভার সংমিশ্রণে এটি হয়ে ওঠে এক সৃজনশীল সমৃদ্ধময় সংকলন ক্ষেত্রে পত্রিকায় লেখার মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের বৃহত্তর বিকাশ ঘটাতে পারবে এই আশা রাখি।

একটি গ্রামীন ও প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়, এখানকার এলাকাবাসীরা যার জন্য গর্বিত। সেই পরিমন্ডলে পথচলা শুরু করে আমাদের মহাবিদ্যালয় একদিন তার মহীরূহ পরিণত হবে এই আশা রাখি। সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, আগ্রহে, সহযোগিতায় আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবে 'সিদ্ধিজ্যোতি'ও নব নব ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলবে এই প্রত্যাশা রাখি।

পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

ড. উমা ঘোষ

অধ্যক্ষা, সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়।

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে

বিগত চারবছরে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি করোনা ভাইরাসের করাল গ্রাস যা সমগ্র পৃথিবীকে করে দিয়েছিল স্তব্ধ। এরই মাঝে আমরা হারালাম আমাদের মহাবিদ্যালয়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা শ্রী নির্মলচন্দ্র মাইতি মহোদয়কে। এছাড়াও আমরা সাক্ষী থেকেছি রুশ ইউক্রেন মারণ যুদ্ধের বীভৎসতার। এই চরম অস্থির সময় থেকে উত্তরণে সাহায্য করতে পারে একমাত্র সাহিত্য– যা আমাদের আশ্রয়, আমাদের মানসিক শান্তি।

সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের এগিয়ে চলার বন্ধুর পথে ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবন্ধুকর্মীদের অক্লান্ত সংযোগিতা ও উদগ্র বাসনা না থাকলে চলার পথ এতটা সহজ হত না। কলাবিভাগ থেকে বিজ্ঞানবিভাগ প্রতিটি বিভাগে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফলে তার প্রতিফলন ঘটেছে। শুধুমাত্র প্রজ্ঞামূলক স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে সর্বত্র সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীতেও। ফল স্বরূপ এই 'সিদ্ধিজ্যোতি' পত্রিকা। 'সিদ্ধিজ্যোতি' শুধুমাত্র একটা পত্রিকা নয়, এটি হলো সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখপাত্র। ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা ব্যক্ত করার প্রয়াসে এগিয়ে এসেছে সিদ্ধিজ্যোতি। ইতোমধ্যে দেওয়াল পত্রিকার মাধ্যমে প্রতিটি বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু সিদ্ধিজ্যোতি পত্রিকার পরিসর আরো বড়, আরো ব্যক্ত, আরো প্রকাশিত যা শুধুমাত্র মহাবিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে তার জ্যোতি ছড়িয়ে যাচ্ছে সকল শুভানুধ্যায়ী, এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথা সকল অভিভাবকবৃন্দের কাছে। মহাবিদ্যালয়ের সাফল্যের মানদন্ড বিচার করুন পত্রিকার পাঠক পাঠিকারাই।

একাদশবর্ষ অতিক্রম করে দ্বাদশবর্ষে পা রেখেছে আমাদের প্রিয় মহাবিদ্যালয়। এখনো অর্থনৈতিকভাবে মহাবিদ্যালয়ের পরিকাঠামো সম্পূর্ণ উপযুক্ত নয়, প্রয়োজন আরো শ্রেণীকক্ষ, সেমিনার হল, অডিটোরিয়াম, কমন রুম, কম্পিউটার ল্যাব সহ আরো আনুসঙ্গিক পরিকাঠামো। চাই খেলার মাঠের সংস্কার, সবুজে সাজানো উদ্দ্যান ও তাকে রক্ষণের উপযুক্ত পরিকাঠামো। তবুও স্বপ্ন দেখি আমরা, এগিয়ে চলি আমরা, উন্নয়নের লক্ষ্যে আত্মবিশ্বাসী আমরা। মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা 'সিদ্ধিজ্যোতি' হোক আমাদের পতাকা, আমাদের মশাল, আমাদের এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণা।

যাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এ পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ অসম্ভব হত, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. প্রত্যুষ কুমার জানা তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ড.শ্যামশ্রী সুর
আবুকালাম অলবিরুনি
যুগ্মসম্পাদক

সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়

শর্মিষ্ঠা করণ (প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

প্রনাম জানিয়ে শুরু করি এক মহাবিদ্যালয়ের কবিতা
সেখানে রয়েছে 'নির্মল মাইতি' স্যারের অমূল্য ভূমিকা
'সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়' তাঁরই প্রতিষ্ঠান
এখানে লুকিয়ে আছে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতের প্রাণ।
এবার বলি আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকার কথা
যাদের আশীষ ছাড়া জীবনের ষোল আনাই বৃথা।
প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত হেড ম্যাডাম
সবার আগে রাখবো আমরা তাঁর সম্মান।
পরিমাপ ও মূল্যায়ন হল শ্যামাশ্রী ম্যামের বিষয়
সহজ মনে হলেও তা মোটেও সহজ নয়।
শান্তি শিক্ষা নিয়ে পড়ান মৌমিতা ম্যাম
এই বিষয়ে রয়েছে ওনার প্রগাঢ় জ্ঞান
দেবাশিষ স্যারের 'রাশিবিজ্ঞান' বড়ই ভালো লাগে।
আধুনিক যুগে চলতে গেলে এটাই কাজে লাগে,
মোজাম্মেল স্যার 'শিক্ষক শিক্ষা' পড়ান ভালো করে
বুঝতে না পারলে তিনি বোঝান সময় ধরে।
শুভজিৎ স্যার, সুরজিৎ স্যার, বিপ্লব স্যার,
সব্যসাচী স্যার প্রত্যেকেই করেন বড়োই কেয়ার।
আমরা সকল ছাত্রছাত্রী
সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের পাশে থাকব চিরকাল।

ধান কাটা

সৌমেন রানা (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

কৃষক ভীষণ চিন্তায় আজ
ধান কাটতে হবে।
মাঠে রয়েছে সোনার ফসল
মেঘ করছে গর্জন।
সোনা রঙের সোনার ফসল
এইতো তাঁর প্রাণ।
ঘরে উঠলে সোনার ফসল
চিন্তার অবসান।
না উঠলে সোনার ফসল
সবাই পড়বে দুর্বিপাকে।
আকাশে মেঘ-রোদ, মাঠে পানি
এদিকে শ্রমিকের অভাব।
কৃষকের বুক করে ভয়ে দুরু দুরু
তুলতে হবে ঘরে সোনার ফসল।

আমি হব একজন ডাক্তার

শুভজিৎ মান্না

নাম আমার শুভজিৎ মান্না
ইংরেজি বিভাগের ছাত্র
মন্দিরা, শর্মিলা, অন্তরা ভালোবেসে নাম দিয়েছে ডক্টর।
কারণ আমি স্বপ্ন দেখেছি হব আমি ডক্টর।
অসুস্থ লোকের চিকিৎসা করে,
রোগ নিরাময় করব।
সর্বদা বিনয়ের সহিত কথা বলবো।
হব আমি আদর্শ ডাক্তার।
রোগ এবং মৃত্যুর সাথে লড়াই করে
বাঁচাব আমি রোগীর প্রাণ।
সর্বদাই প্রস্তুত থাকব আমি,
রোগীদের সেবা করতে।
ক্লান্তিহীন ভাবে লড়ব আমি,
মাথা উঁচু করে বাঁচব আমি রোগীর সেবা করে।

নারী

প্রিয়াঙ্কা ঘোষ (ইংরেজি বিভাগ)

আমরা নারী,
আমরা সবই পারি।
মানব না হার
আমরা,
কেনো মানব,
কে হে তোমরা?
জেনে রেখো তোমরা
আমরা শক্তি স্বরূপিনী,
লড়াই আমাদের রক্তে আছে,
জয়ী হব আমরা
জীবন দিয়ে,
তবুও
মানব না হার
আমরা,
তুচ্ছ ভেবোনা আমাদের
আমরা নারী,
আমরা সবই পারি।

আমার মা

প্রভাতি ঘড়া (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ, প্রাক্তন ছাত্রী)

মা আমার বড্ড বকেন
করি কেবল খেলা,
খেলতে খেলতে কখন যেন
বয়ে যায় যে বেলা।
আমি বলি মাকে আমার
ভাবছো মিছিমিছি
তোমার আসা করবো পূরণ
ছোট্টো এখনও আছি।
বড়ো হলে হবো আমি
লাড বাবুদের সমান,
পাড়া প্রতিবেশীরা সব
করবে আমায় প্রণাম।

বন্ধু

জোৎস্না ভূঞ্যা
(শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ, প্রাক্তন ছাত্রী)

বন্ধুত্ব শুধু একটা শব্দ নয়
নয় শুধু একটা সম্পর্ক।
বন্ধু থেকে যায় যদি রাখতে পারো
শৈশব থেকে বার্ধক্য।
এমন একটি বন্ধু থাকবে
যার মন হবে আকাশ সমান।
যাকে মুখ ফুটে বলতে হবে না
তোমার চোখ দেখে বুঝে যাবে মান-অভিমান।
জীবন যদি হয় একটি রেসিপি
বন্ধু হল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
প্রকৃত বন্ধুই হাতে রেখে
সুখ-দুঃখ ভাগ করবে আজীবন।
সাফল্যে তো অনেক বন্ধু আসবে
যারা শুধু থাকবে সুখে।
ব্যর্থতায় যে থেকে যাবে
তাঁকেই রাখতে হবে বুকে।

অদ্ভুত সমাজ

কাকলি ভূঞ্যা, (প্রাক্তন ছাত্রী, দর্শন বিভাগ)

'সমাজ' তুমি ভীষণ অদ্ভুত, বোঝা বড় দায়।
বিয়ের সময় যাত্রী আগে বর পেছনে যায়।
শ্মশাণ ঘাটে যাওয়ার সময় মৃতদেহ আগে
জানিনা কেন এমন হয়!
শুভ কাজে পেছনে আর দুঃখের সময় আগে।।
যে মোমবাতি নিভিয়ে জন্মদিন পালন
করলাম --- আবার কোনো একদিন সেই মোমবাতি
জ্বালিয়ে মৃত মানুষের মৃত্যুদিন স্মরণ করলাম।
কী অদ্ভুত আলো নিভিয়ে জীবন শুরু করছে।
আর আলো জ্বালিয়ে জীবন শেষ সেটা বোঝানো হচ্ছে।
শত টাকার জুতো হয়েও সে পায়ের তলায় রয়।
আবার এক টাকার টিপ হয়েও তার কপালে স্থান হয়।
এ সমাজে সব কিছুই অদ্ভুত ঘটছে। তাই তো —
রাস্তার মোড়ে মদ দোকানে মানুষের অভাব নেই।
আর দুধ বিক্রেতা দ্বারে দ্বারে গিয়েও কেনার মানুষ
নেই।
এটাই আমাদের সমাজ ....
সত্যিই তুমি অদ্ভুত।।

My Little Sister

Pallab Guchhait (English dept.)

Two yolks on a stalk,
We are brother and sister.
As Apu has Durga,
You are mine.
We are like Tom and Jerry.
The fun is now the fight
You are the relief of my tiredness,
You are my happiness.
When I see the smile,
On your beautiful sweet face.
My sad hart is filled with joy.
You are my dear little sister
I love you more than everyone.
You are not like everyone else.
No demand, just a little love.
When you tie rakhi on my hand
What to fear I will protect you.
When comes night
You are my light
You will grow up in life
I love you so much
My little princes.

পড়ার যন্ত্রনা

সন্তু কুইল্যা, প্রাক্তন ছাত্র

সকালে উঠে পড়তে যাই
দুপুরেতে কলেজে যাই।
লিখে লিখে খাতা শেষ,
এরই নাম ছাত্র দেশ।
বাড়ির মানুষ মনে করে।
আছি কতো সুখে,
কী যে ব্যাথা জমা আছে,
আমার পোড়া বুকে।।
অনেক কষ্ট হয় মা গো
ঝরে মাথার ঘাম,
তারপর রেজাল্ট খারাপ হলে।
কেউ দেয় না দাম।।

Studying

Antara Dolai (English dept.)

Studing is the first companion in everyone's life.
Which, taught to recognize the mistake,
Filled the darkness with light
And brought a new life.
Education is like flowing river
That, carries many small pebbles and stones
But came everyone mach the destination together ?
We know there is no end to study
But now what will be the next result ?
Unemployment life ?

স্কুল জীবনের শেষ দিনের কবিতা

বনশ্রী জানা, (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

যখন স্কুলের শেষ ঘন্টাটা বাজল,
চোখের জল মুছে সারা ক্লাস কোলা কুলিতে মেতেছিল।
সেই বেঞ্চ, সেই ব্লাকবোর্ড, সেই দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাসটা
ফাঁকা হয়ে গেছে আজ।
রয়ে গেছে শুধু বেঞ্চ
আর ভাগ করা টিফিন বক্স।
আজ পারলাম না।
শেষ দিনের প্রতিটা মুহুর্তটিকে মুছে দিতে,
একটার পর একটা ঘন্টা পেরিয়ে এসেছি,
শেষ বারের মতো টিফিনের ভাগ পাওয়া
শেষ বারের মতো নানা অজুহাতে জল নেওয়ার বাহানা,
শেষ বারের মতো তোর ভিজে চুল টেনে পালানোর
সেই ঘটনা গুলো,
আজ আমার মনের মাঝে খোঁচা দেয়।
মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মতো চমক দিয়ে।
চোখের সামনে জলছবির মতো,
ভেসে যাচ্ছে একটার পর একটা স্মৃতি।
বৃষ্টি ভেজা কাচের জানালার থেকেও বেশি
আবছা হয়ে যাচ্ছে।
না বলা সম্পর্কের সম্পূর্ণ উপন্যাসটা।
মন চাইলেও আর সেখানে যাওয়ার অনুমতি নেই।
সেই বেঞ্চ, সেই ব্লাকবোর্ড - সব রয়েছে একই
শুধু আমি আর ছুতে পারবো না।
প্রথম ভালোবাসা সেও চলে গেল দূরে
প্রথম ক্লাস কাটার স্মৃতি নিয়ে
সবাই ব্যস্ত হবে কালের নিয়মেই
পূর্ণমিলন হবে কি আর
সবাই বদলে গেছে আজ।
শুধু ক্লাস ঘর রয়ে গেছে আমার স্মৃতি নিয়ে।

ওজন বুঝে ভোজন করো

মিতালী পাঁজা
(শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ, প্রাক্তন ছাত্রী)

মিষ্টি খেলে সুগার বাড়ে,
ঝাল খেলে পিলে
হয়না হজম খাদ্য
কেউ যদি খায় গিলে।
মাংস, মাখন, তেল
অধিক খেলে পরে।
দেহের মধ্যে স্তরে স্তরে
চর্বিতে যায় ভরে।
ধূমপানেতে বাসা বাধে
দেহে জটিল রোগ।
মদ খেলে ভাই ভাগ্যে জোটে
কতই না দূর্ভোগ।
ওজন বুঝে ভোজন কর
যখন যেটা পাবে।
খাওয়ার পরে খাওয়া পেলেও
কখনোই না খাবে।

প্লে গ্রাউন্ড vs ব্যাটল গ্রাউন্ড

সমীর ভূঞ্যা (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

কতই না শুনছি
Free Fire না PUBG
কারো কাছে আজ AKM
তো কারো মুখে AWM
মাঠে তো সবাই আছে
নেই শুধু ব্যাট আর বল,
সামনে গেলেই বোঝা যায়
এরা সব Video game এর দল
Tuition, College পড়ে থাক সবই
এখন অন্তত একটা ম্যাচ খেলি
আগে থাকত দলে এগারো জন,
জিতলে শোনা যেত 'Hurrah'
এখন দলে হয়েছে চারজন
আর জিতলে হয় 'Booyah'!
কয়েক বছর আগে ছিল সবুজ কাদা Play Ground
আজ সেটা হয়ে গেছে সাত বাই ছয় ইঞ্চির BattleGround
পড়ে থাকুক, শুধু মনটা Video game এর দিকে
এবার রেহাই দাও গো আমায়
এই মুখপোড়া গেম থেকে।

ইচ্ছেডানা

শ্রাবনী হেম্ব্রম (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

হরেক রকম ইচ্ছেগুলো
মেলেছে আজ ডানা।
উড়ে যেতে চাই
সব বাঁধন ছেড়ে।
এই ঘন নীল আকাশে
কেউ যেন করে না মানা
এ মনের ইচ্ছে ডানা।
যতই মনে হয় এ শহর চেনা
তবুও আমার লাগে অচেনা।
মন চায় ডানা মেলে উড়ে যেতে
দূর ঐ দূর আকাশে।
কিন্তু মন তো তা বোঝে না
এ জীবনের বাস্তবতা।
থাক না কিছু ইচ্ছেগুলো
পূরণ হোক বা না হোক।
সবার ভালোবাসা নিয়ে
স্বপ্নগুলো যাক এগিয়ে
ডানা মেলে ঐ নীল আকাশে
হরেক রকম ইচ্ছেগুলো।

প্রথম কবিতা

শ্রীতমা বিশ্রাম
(প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

লিখতে বসেছি প্রথম কাব্য
জানিনা কেমন হবে।
হয়তো কোথায় হারিয়ে যাবো
মনে পড়বে কবে।
হয়তো বা হতেও পারে
ম্যাগাজিনে ছাপা।
তখন মনের আনন্দটা
রইবে আর চাপা!
এভাবেই তো কতজন
হয়েছেন মহাকবি।
আমিও কী পারবো হতে?
শুধুই মনে ভাবি।

কলেজ জীবন

শিউলি পাল (প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

একটু অবসরে বসে বসে ভাবি খালি
একদিন শেষ হয়ে যাবে কলেজ জীবনটাও,
থাকবে কিছু স্মৃতি আর কিছু বন্ধু-বান্ধব;
হারাবে বেঞ্চের আড্ডাগুলো সব
বন্ধুদের সাথে টিফিন বক্স নিয়ে কাড়াকাড়ি হবে না আর
ক্লাসে স্যারের লেকচার বড্ড একঘেয়ে লাগত;
সেগুলো আর শুনতে হবে না ভেবে মানে না মন
তবুও স্মৃতিগুলোকে নিয়ে দিব্যি চলে যাবে এ জীবন।

স্বপ্নময় জীবন

রিনু প্রামানিক (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

স্বপ্ন দেখতে নেই
স্বপ্ন দেখাটা বেদনাদায়ক
প্রত্যাশিত জীবনের সময় বেজে ওঠার পূর্বে
উপস্থিত নব নব আঘাতের বিপুল সম্ভার
উৎকণ্ঠিত চোখে উচ্চে তাকানো।
ঝলমলে তারার দিকে তাকিয়ে ভাবছি
এইতো নব জীবনের পদার্পণ
ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ।
অচেনা ভিড়ের পথে চলেছি আমি
পেছন ফিরে দেখি একা
চরম দুর্ভোগের অধিকারী
ভাবনা চিন্তাগুলো ঘুমে আচ্ছন্ন
বহু যত্নে লালিত করা সেই স্মৃতি
একরাশ মেঘ ঢেকে দিয়েছে মন
হাতড়াতে-হাতড়াতে এগিয়ে চলছি আজও
এবার হয়তো জীবনের পূর্ণতা আসবে
বালুকা বেলায় মনে পড়ে সহস্র স্মৃতি
তাহলে জীবন কি তোমায় ভালোবাসে না?
না কি তুমিই জীবনকে ভালোবাসোনা ?

অভিমান

অনিন্দিতা মন্ডল
(শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

জানি না কার ভুলটা
ছিল বেশি,
তার চেয়ে বেশি আমায়
করছো দোষী।
প্রেম মান অভিমানের
যখন এলো পালা,
তখন খুব সহজে পরে নিয়েছো
তুমি অন্যের মালা।
এ আজব প্রেমের
এমন সুনন্দ কাহিনী,
এর আগে আমি
কখনো দেখিনি।
আর অভিমান করবো না
শুধু বলবো ভালো থেকো,
সব সম্পর্কে অভিমান আসে
শুধু এইটুকু মনে রেখো।

খাতার গুন

মধুমিতা মান্না
(শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

খাতায় লেখা বই-এর ভাষা।
বই-এর জ্ঞান খাতায় খাতায়।
নিজের হাতের লেখা পাতায়
মনে করিয়ে দেয় আগের ভাষা।
খাতায় খাতায় লেখ সবাই
মনে থাকবে সবই ভাষা।
খাতা শেখায় লেখার ভাবনা
সবাই বুঝে যেন এই খাতার গুন।

স্বামী বিবেকানন্দ

পিয়ালী জানা (প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

তোমার বাণী, আদর্শ, দর্শিত পথে
চালিত হোক যুব সমাজ, তোমারি মতে।
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মুখরিত হোক
সমাজ কল্যাণের প্রতি খাতে খাতে।
তোমার বাণী বিঘোষিত হোক
যুবকের মননে চিন্তনে,
দূরীভূত কর বিভ্রান্তিকর
রাজনৈতিক নাগপাশ।
ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে
সবে নেমে পড়ি মানুষের কল্যাণে,
চিরন্তন, চিরহরিৎ হোক ভারতবর্ষ
স্বামীজির শুভ জন্মদিন।।

ফ্যাকাশে

শিউলি পাল (প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

আকাশ যেন কেমন ফ্যাকাশে
মেঘগুলো ঠাসা খাসা।
বস্তাপচা ময়লায়, ধোঁয়ায়
পৃথিবীটা গেল বদলে।
এসে গেল 'কোভিডযুদ্ধ'।
মানবিক পৃথিবীতে
কালো আতঙ্কের হতাশা
নিঃশ্বাসে শুধু অবিশ্বাস।

বোবা-কালা মুখদর্শন।
অর্ধমুখমন্ডলকে ঢেকেছে
সূর্যগ্রহণে।
পূর্ণগ্রাসে চন্দ্রাভিমান ক্লান্ত
জনজীবনের বলিরেখা।

দিনের আলোয় আঁধার দিবানিদ্রা
মিডিয়াতে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের আগ্নেয়গিরি —
ধানের তুষকে জ্বালিয়ে দিয়েছে।
তুষারে ঢেকেছে শয্যা।
পরিবেশ দূষণ শারীরিক দূষণের কালিমা।
শব্দদূষণের চিতাভস্ম।
কবে এর সমাপ্তি?
জানা নেই
কবে আসবে জীবনের রক্ষক?
বোঝা যাচ্ছেনা।
আপেক্ষাই আপেক্ষার আপেক্ষায়।

মা সরস্বতী

মৌসুমী পাত্র (প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

মাগো তোমার পূজা করি
বছর বছর ধরে।
শুভমতি দাও মাগো
যেন ভালো করে পড়ি।
আমায় তুমি বিদ্যা দাও,
তোমায় দেব ফুল,
পরীক্ষার খাতায় এবার
না হয় যেন ভুল।
একটু দেখো প্রশ্নগুলি
সহজ যেন হয়,
তোমার আশীর্বাদ পেলে মা
আর করি না ভয়।
শ্বেত হংস দেব তোমায়
বীণা দেব হাতে
পরীক্ষার সব কটা দিন
থেকো আমার সাথে।

আহ্বান

পূজা বেরা (বাংলা বিভাগ)

প্রকৃতি আমায় হাত বাড়িয়ে ডাকে,
হারাতে ইচ্ছে হয় সবুজ পথ আর
নদীর বাঁকে।
রাতের আকাশে চাঁদের আলোর দেশে,
আমিও হারিয়েছি গোধূলি বেলার শেষে।
ঊষাকালে শিশির ভেজা ঘাসে,
ছুঁয়ে দিলেই মনে, আলাদা প্রাপ্তি আসে।
সকাল হতেই পাখিদের কলতান,
সাথে তাল দেয় খরস্রোতা নদী প্রবহমান।
বর্ষার দিনে বৃষ্টি ভেজা রাত.....
ফিরে পেতে চাই, শত শত বার।
প্রকৃতির ভিন্ন সাজ,
ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর আগমনে।
প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখেছি,
প্রকৃতির দর্পণে।

কল্পনা

মণিকা মান্না (দর্শন বিভাগ)

জেগে আছি রাতে
দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে —
ইচ্ছা করে এ জগৎ ছেড়ে
যাই কোথাও পালিয়ে
দূরের সেই তারাটার মতো
দাঁড়িয়ে আছি একা
রাত্রি কেটে শুরু হচ্ছে ভোর
কেটে যাচ্ছে আমার স্বপ্নের ঘোর
সুখের স্বপ্নের শেষে
ফিরে এলাম কষ্টের দেশে।

অভিমানী মন

মৌসুমী মন্ডল (বাংলা বিভাগ)

আমি তো দেখেছি তোর অভিমানী মন,
সেই শৈশব থেকে।
তবুও যখন তুই অভিমান করতিস –
কারণে অকারণে।
সেই ছলছল আঁখি।
বিষাদ ভরা মুখ,
স্মৃতিতে এখনো আসে।
বন্ধ হয়ে যেতো তোর কথা বলা —
আমাকে শাস্তি দিতে—
দুঃখ পেতাম তোর অভিমানে,
আনন্দ পেতাম এই ভেবে যে —
অভিমান সারানোর চাবিকাঠি
আছে যে আমার কাছে!
অভিমান শেষে
অশ্রুবিন্দু মুছে,
আসতিস আমার কাছে।
তখন কথা হতো হাসি মুখে,
ভাবতাম আবার কবে —
তোর অভিমান হবে।

হে নরেন্দ্রনাথ

ইপ্সিতা মেট্যা (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

হে পার্থপ্রতিম ওগো, দিশারীর তুমি দিশা।
যুব সমাজের হৃদয়দ্বারে ঘুচিয়েছ তামানিশা।।
প্রভাতের আলোকে তোমায় আমি সর্বদা করি স্মরণ।
তোমার মহিমায় স্বতসিদ্ধ তুমি, তোমাকেই করি বরণ।।
হিন্দু পুনজাগরনের তুমিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।
তোমাকে দেখলে আমার চিত্ত হয় পূর্ণশুদ্ধ।।
শিক্ষা,দীক্ষা,বেদ,উপনিষদে তোমার মহিমা অপার।
নারী কল্যাণে অসীম তুমি, তোমার দ্বিতীয় মেলা ভার।।
তোমার বাণী শুনে, মনে কী আনন্দ।
তুমিই আমার জ্ঞান,ওগো স্বামী বিবেকানন্দ।।
কাঁপিয়েছো তুমি হুংকারে, এই বাংলার মাটি।
দেখিয়েছো তুমি দেশবাসীকে, তুমি বাঙালি খাঁটি।।
স্মৃতিকথায় 'শ্রুতিধর' তুমি, পান্ডিত্যে সংস্কৃত।
যুবসমাজের মেরুদন্ড সোজা করে, গড়ে তুলেছ ভিত।।
অন্ধকার থেকে চক্ষু উন্মোচনে, ঘুচিয়েছো জাতপাত ।
প্রনাম তোমায় সহস্রবার হে নরেন্দ্রনাথ।।

মেয়েদের সম্মান

মধুমিতা মান্না (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

মেয়েদের কথা ভাবে না সবাই
ভাবে শুধু ছেলেদের কথা।
মেয়েরা নিজের স্বাধীনতা চাই,
সেটাই দিতে চায় না সবাই।
মেয়ে বলে কষ্ট পাবে
ভাবনা লোকের যাবে কবে।
উচ্চশিক্ষিত হবে যখন
মেয়েরা পাবে সম্মান তখন।

স্বপ্নের সন্ধানে

ছন্দা মন্ডল
প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষা বিজ্ঞান

নীল আকাশের মাঝে আজি এই সুপ্রভাতে
একখন্ড সাদা মেঘ ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে।
আজ চিন্তাশূন্য মনে, মেঘ যেন খুশি,
সকালটা শুরু করেছে, যেন কোনো সুন্দর এক স্বপ্ন নিয়ে।
তাই স্বপ্নাকাশের বুকে আজ ভেসে বেড়াচ্ছে।

স্বপ্ন সত্যি না করতে পারায় -
মেঘ কেমন সর্বহারা হয়ে গিয়েছিল।
আজ নতুন করে স্বপ্ন গড়ার পথে এগিয়ে চলেছে।

আজ সকালের সুবাস ও খুব খুশি
তার স্নিগ্ধতা আজ পৃথিবীর প্রকৃতিকে দোলা দিচ্ছে।
যেন কিছু হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের সন্ধান পেয়েছে।
পাখিরা আজ ব্যস্ত, নিজেকে মেলে ধরার জন্য।

আকাশ আজ হাসছে,
বাতাস আজ কথা বলছে,
গাছেরা আজ স্বপ্ন দোলায় দুলছে,
এমন সব কিছুর মাঝে, স্বপ্ন উঁকি মারছে।

স্বপ্ন

রিয়া বেরা, (প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ)

এইবার স্বপ্ন শেষ করো;
দীর্ঘশ্বাসে কথা বসিয়ে দেখছতো,
সুরের সুতো বেঁধে!
দেখেছ তা দীর্ঘশ্বাসই থেকে গেছে,
গাথা হয়নি তো!
স্নানের স্বপ্ন শেষ করে,
মজে গেছে দিক ছোঁয়া বিশে।
সারাদেশ শয্যা শাসন করে,
প্রান্তরের রূপসজ্জা ছলে।
অন্ধকারের কাছে নিঃশর্ত হারে
সে আঁধারে খুঁজে দ্যাখো হয়ত দাঁড়িয়ে
কাঁটা বিঁধে পায়ে শেষ অত মিল।।

প্রথম বৃষ্টি

লিপিলেখা শাসমল
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

প্রখর তাপে রৌদ্র জ্বালায় ছন্নছাড়া সৃষ্টি।
প্রানের জ্বালা জুড়িয়ে দিয়ে নামল প্রথম বৃষ্টি।।
ধূসর কালো আকাশ জুড়ে বৃষ্টির সাদারেখা।
চৈত্রমাসের শেষ লগ্নে প্রথম বৃষ্টির দেখা।।
গাছের পাতায় ঝিরিঝিরি টিনের চালের বাদ্য।
মনের পাতায় স্মৃতি রেখে যায় বাদল দিনের পদ্য।।

উন্মাদ

মানসী মাইতি,
(শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

তোমার প্রেমের গল্প নিয়ে
কবিতা লিখেছি আমি,
খুশির সাগরে ভাসতে গিয়ে
হারিয়ে গিয়েছ তুমি।
রোজই রাতে স্বপ্ন এসে
আমার কানে কয়,
দু'দিনের এই খেলাঘরে
কেউ তো আপন নয়।।
স্বপ্ন ডাকে তোমার কাছে
স্মৃতি ডাকে পিছু,
ভুলতে পারি না যে আমি
তোমার প্রেমের কিছু।।
কেমনে ভুলে গেলে তুমি
গল্প করার রাত,
তোমার জন্য হই আজও
আমি বারে বারে উন্মাদ।।

সর্বশিক্ষা

শুভ রায়, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ

সর্বশিক্ষা সর্বশিক্ষা
করছো তুমি কী?
এই দেখনা আমি কেমন
মানুষ গড়েছি।
কী কী মানুষ কী কী মানুষ?
আমায় বলনা ভাই
কৃষক শ্রমিক মজুর বেকার
আরকি বল চাই।

মুঠো ফোন

রিনু প্রামানিক (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

বৃষ্টি ভেজা রাতে
আফিস ফেরৎ হয়েই
(উনি).... এন্ড্রয়েডে স্পর্শ।
টেবিলে খাবার দিতে না দিতেই
(গিন্নী)... সোশ্যাল মিডিয়ায় মত্ত
পড়াশোনা শিকেয় তুলে
(ছেলে)... নীল রঙিন টিভিতে স্বচ্ছন্দ
(ঘটনা)... রাত গড়িয়ে যায়
ঢাকা দেওয়া খাবার ঢাকাই থাকে
রাত শেষ হয়ে যায়
কেউ কাউকে সময়
দিতে পারে না.....

প্রিয় বন্ধু

মাম্পি খাটুয়া, (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

বন্ধু তোমার চোখের মাঝে চিন্তা খেলা করে
বন্ধু তোমার কপাল জুড়ে চিন্তা লোকের ছায়া
বন্ধু তোমার নাকের ভাঁজে চিন্তা নামের কায়া
বন্ধু তোমার মন ভালো নেই আমার
বন্ধু তুমি একটু হেসে, একটা কথা বোলো।
বন্ধু আমার বন্ধু তুমি, বন্ধু মোরা ক'জন
তবুও বন্ধু, মন হলো না আপন
বন্ধু আমার বুকের মাঝে বিসর্জনের ব্যথা
বন্ধু তুমি অমন করে যেয়ো না আর একা।
বন্ধু এসো স্বপ্ন আঁকি চারটা দেয়াল জুড়ে
বন্ধু এসো আকাশ দেখি পুরোটা চোখ খুলে
বন্ধু এসো জলে ভাসি দুঃখ ভাসানোর সুখে
বন্ধু তোমার বন্ধু আমি, বন্ধু মোরা ক'জন
তবু বন্ধু, ভাসি নাকো আঁকি নাকো স্বপন।

আগমনী

লাবনী মাইতি
(প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষা বিজ্ঞান)

শিশিরে শিশিরে
শারদ আকাশে,
ভোরের আগমনী।
সবার প্রানে শারৎ গানে
খুশির প্রবাহিনী।
আনন্দময়ী আসছে ঘরে
ভরাতে সবার প্রাণ।
কাশের ফুলে হাওয়ায় দুলে
মায়ের খোলা চুল।
টুকটুকে লাল আলতা পায়ে
কানে দোলে দুল।
ঢাকের তালে কোমর দোলে
বাজায় ঢাকি ঢোল।
আগমনী মা যে এলো
খুশির দরজা খোলো।
আনন্দে আজ উথলে উঠে
খুশিতে সবার মন।
মহালয়ার মন্ত্র ধ্বনি
পবিত্র তার সুর।
সেই সুরে মাতোয়ারা
খুশিতে ভরপুর।
ধানের শিষে শিশির দোলে
সূর্য সোনার হাসি।
তাইতো আমরা দূর্গা মাকে
সবাই ভালোবাসি।।

গাছ আমার বন্ধু

সোনালী কাজলী (প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষা বিজ্ঞান)

ও বন্ধু গাছের সারি
তোমাদের মধ্যে নেইকো কোন আড়ি
তোমাদের দৃষ্টি দূর পানে-
তোমাদের ডাক পড়ে যেন আমার কানে।
তোমারা পৃথিবীর আদিম প্রাণী
তোমাদের মনে নেইকো কোন হানাহানি।
তোমরাই প্রভু, তোমরাই ভগবান
তোমাদের ছায়ায় পথযাত্রীর বিশ্রাম।
ফুল, ফল তোমাদেরই দান।
তোমরাই মানুষের প্রান বাঁচাও।
ও বন্ধু গাছের সারি
তোমাদের নেইকো কোন মান অভিমান।

শহীদ

প্রাক্তন ছাত্রী, মিতালী মন্ডল

মৃত্যু-মিছিল দেখেছি কি মোরা, দেখেছি কি হাহাকার?
ছেলেহারা মা, পাষান হৃদয়ে অশ্রু ফেলে না আর।
বিরহীনি প্রিয়া আকুল আবেগে পথ চেয়ে থাকে কার,
কপাল পুড়েছে জানে না মুন্নী ফোনে এলো সমাচার।
কফিন বন্দী ফুলে ঢাকা দেহ 'শহীদ' হলো যে পিতা।
আলুথালু বেশে ভীরু পায়ে এসে মমতাময়ী সে মিতা।
চোখের জল যে বাধ মানেনা পরিবেশ হলো ভারি।
বিশ্বের কাছে নিন্দিত হলো ঘৃণিত কর্মচারী,
পাড়া প্রতিবেশী ছুটে এল সবে, এ কী নিয়ে এল বয়ে!
জাতীয় পতাকায় সযত্নে ঢেকে জয়জওয়ান গাঁথা গেয়ে।
''বীর জওয়ান অমর রহে''- ডাক দেন 'ব্রিগেডিয়ার'।
সীমান্ত সেনা সদা জাগ্রত , - যেন সে চৌকিদার।
মরদেহ আজ পুড়ে ছাই হলো অনলে হলো সে লীন।
কারও দেহ হলো কবরে শান্ত নিদ্রিত চিরদিন।
শান্তির বাণী মাথাকুটে মরে, কে - বা শোনে কার কথা।
রণহুঙ্কারে ব্যস্ত সে দেশ - 'কার ঘাড়ে কটা মাথা'
বিশ্বের যত মহা মনীষী যত সব অবতার।
সবাকার তরে শান্তির কথা প্রচারিছে বার বার।

ও পাখি

সুরেশ দোলই, (শিক্ষা বিজ্ঞান)

ও পাখি ও পাখি যাচ্ছ কোথায়?
ডেকে যে তোমায় ব্যাকুল ঐ পাড়ার খুকি
একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, ওকি বলে শোনো;
এমন করে আনন্দ বইকি দুঃখ দিওনা যেন
এই তো সবে উঠল ও ভোরের নিদ্রা হতে
তোমার কুহু কুজন শুনে ফাগুনি হাওয়ায় যেতে
তবে কেন যাচ্ছ দলে একটু খানি দাঁড়াও
তোমার কুহু কুজন ওর আবেগে ছড়াও।

শূন্য

মৃণ্ময়ী গোস্বামী
(প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষা বিজ্ঞান)

ছোটো যে হায় হারিয়ে
বড়োর দাবী দাবিয়ে চলে।
এসব মিথ্যে নয়
বুদ্ধিজীবি তাই বলে।
আজ যে ছোটো কাল সে বড়ো
করে মাথা উঁচু।
প্রকৃতির খেলায় মজে
চলে বড়োর পিছু।
মহাকাশে মহাশূন্যে
বিন্দু বিন্দু কনায়।
বৃষ্টি হয়ে বারিধারা
ভরে বসুন্ধরায়।
বামে পরে দিলে শূন্য
নয়সে অনেক ছোটো।
গণিতে শূন্য ডানে
বড়ো জেনে রেখো।
শূন্যটাকে বাদ দিয়ে ভাই
হয়না কোনো কাজ।
এতই কেন গরব বড়
পায়না কি লাজ?

আমি

তনয়া বর, প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

ঝরে যাওয়া পাপড়িহীন গোলাপের মত,
থাকে না গৌরব আর সৌন্দর্য্যে
আমার জীবন এক অভিশাপে ভরা
নেই হাসি, নেই কান্না, নেই আনন্দ
পাশে থেকে যার রাশিভার কান্না,
আর আছে বেসুর ছন্দ।
এ বিশ্বের মাঝে এতো ছোট আমি
পড়ে থাকি এক কোনের মাঝে
এই জীবন যন্ত্রনায় আসে
ঝড়-বৃষ্টি-প্রলয়! আরো কত কী!
গতিধারা মতো বয়ে চলে
একে একে একে
আমি সেই ছোট পাথরের নুড়ি
পড়ে থাকি এই বাংলার পথে
আমি পুড়ে যাওয়া এক দেশলাই কাঠি
আমার ঠাঁই নেই কারো দ্বারে,
তবু আমি থাকি চেয়ে
সুন্দর দুটি পা এর প্রত্যাশায়
যে প্রিয়ার পদাঘাত
আশে তরু উঠত ফুটে
সে পায়ের চিহ্ন দেবনা আমায়।।

ছেঁড়া কবিতার পাতা

রিমি পোড়্যা, (প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ)

যদি কোনো ছেঁড়া কবিতার পাতা
হাতড়ায়, মম ধূলিধূসরিত মন্দিরে
সন্ধ্যা তারার মতো যদি হারিয়ে না যায়
তার ভাষা, সূর্যের গাম্ভীর্যে।
না যদি লুকানো থাকে কোষ্ঠী পাথরে
তবে ডেনড্রাইটের গভীরতার
কেবল একটি চুম্বনে বাঁধবে সকল সরলতা।

যদি আমি স্বার্থপর মেঘ হই
তৃষ্ণায় ফেটে পড়া ধরনীকে এক বিন্দু বারি
না দিয়ে ভেসে বেড়াই সারা আকাশ জুড়ে।
যদি চাতকের প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়ে লালা ঝরায়
মৃত্তিকা শৈল শিরায়-
তবে বৃষ্টি নিয়ে উড়ে বেড়ানো
মেঘ নামে কলঙ্কের রাজটীকা যে কতটা
নিন্দুক ব্যাথার আগুনে আমায় আহুতি দিতে পারে
তা আমার থেকে বিশেষ কেউ জানবে না।
কেবল আমার ছেঁড়া কবিতার পাতা
ব্যাথার সূর্য দাগ নিয়ে পড়ে থাকবে নীরবে
কলঙ্কিনী চন্দ্রিমার মতো।
আমার স্নেহবাষ্প ডুবে যেতে থাকবে
আর মৃত্তিকার কণায় কণায় বাসা বাঁধবে।।

উঠবে ভেসে

অমৃতা রায়
প্রাক্তন ছাত্রী, (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ)

একদিন ছেড়ে যেতে হবে সবাইকে,
মনের দুঃখ চেপে রেখে।
তোমরা সবাই ভুলে যাবে আমাদেরকে,
থাকবে না আর আমাদের স্মৃতি।
আমরাও চাই সারাজীবন থাকতে,
মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস হয়ে।
জানি একদিন সব পাতা ঝরে যাবে,
নদী দিয়ে বয়ে যাবে স্রোত,
আমিও হারাব এই মহাবিদ্যালয়ের স্মৃতি।
শুধু ভুলতে পারব না কাটানো সেই দিনগুলি,
আমার কাটানো মুহূর্ত সর্বক্ষণ।
মহাবিদ্যালয়ের নাম তন্ময় হয়ে থাকবে,
অতীতকে ফেলে আগামীকে নিয়ে।
আমরাই শুধু হারিয়ে যাব,
নীরবে নিভৃতে অন্য পথে।।

ঋতু পরিবার

মৌমিতা পাঁঞ্জা, (প্রাক্তন ছাত্রী, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

গ্রীষ্মের তাপদাহে যখন ধরণী হয় তৃষাতুর,
বর্ষারাণীর শুভ আগমনে সব গ্লানি হয় দূর।
শরৎ -রই শিরশিরে হাওয়া দোলা দেয় মন প্রাণে,
শীতের ঠেলাতে যেতে হয় মাঠে জানিনা কীসের টানে।
মাঠ ভরা ধান, সোনার ফসলে ভরে যায় ক্ষেতগুলি,
মধু ডেকে বলে আয়রে কানাই মাঠে যাই সবেমিলি।
বসন্তেরই দোল উৎসবে রাঙাবো তোদের মুখ,
চৈত্র মাসের চড়ক মেলায় ভোরবে মোদের বুক।

আমার মা

সুমনা জানা (প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ)

সবার থেকে ভালোবাসি
আমার সোনা মাকে।
বাড়িতেই সবাই আছে কিন্তু
মা নেই মানে শূন্য।
খোলা আকাশের নীচে
মা যখন থাকে সবার মাঝে
সবকিছুই তখন থাকে সম্পূর্ণ।
প্রথম যখন হাঁটতে শিখি
মায়ের আঙুল ধরি।
মায়ের হাতটি ধরে
আমারা জীবনটাকে গড়ি।
ছোট্টবেলায় ঘুমের ঘোরে
মায়ের গলা জড়িয়ে ধরি।।
ঘুম পাড়ানি কত গানে
মা আনত ডেকে ঘুমের পরি।।
আধো আধো মুখে যখন প্রথম ফোটে মা।
মা যে তখন বলে ওঠে
কোথায় ছিলিরে আমার সোনা মা।।
মায়ের স্নেহের কত ঋণ
শুধু বাড়িয়ে যায় দিন দিন।।
শৈশব বন্ধু যাবে না কোনোদিনও ভোলা
মাকে ছাড়া জীবন শুধু মরুভূমিতে পথ চলা।।

জীবনের অঙ্গীকার

বনশ্রী মাইতি, প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

জীবনের অঙ্গীকারে গাও জীবনের জয়গান,
জীবনের অঙ্গীকারে বাঁচাও সহস্র কোটি প্রাণ।
জীবনের দিন ক্রমে ফুরাতেছে,
অথচঃ জীবন যেখানে জীবামৃত পেয়ে ধন্য হয়।
দুঃখকে সুখ করে অসৎ কে সৎ করে
গাও জীবনের সহাগান।
ভয়কে জয় করে সাহসকে সঙ্গে নিয়ে
গাও জীবনের জয়গান।
অন্ধকারকে আলো করে কষ্টকে বুকে নিয়ে
জীবনে এনো আরামের পরিতৃপ্ত।
নিরাশাকে সঙ্গে করে কামনাকে দূর করে
জীবনে এনো বাতাস মুক্ত।
হয়তো হবে না মোদের এক সাথে পথ চলা,
অনেক কথাই রয়েছে মনে, যা হয়নি এখনো বলা,
জীবনের অঙ্গীকারে গাও জীবনের জয়গান,
জীবনের অঙ্গীকারে বাঁচাও সহস্র কোটি প্রাণ।

সাঁঝবাতি রূপ কথা

তনয়া বর, প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

বৃষ্টি যখন নামল শেষে,
রিমঝিমিয়ে হৃদয় মাঝে।
একটা দুটো চোখের ভিড়ে,
আঝোর ধারায় স্বপ্ন সাজে,
তুমি বললে একটু থামো।
স্বপ্ন আমার হয়নি পূরণ,
খোঁজ চলেছে আকাশেতে
মিলবে কি সেই সোনার গড়ন?
আমি হলাম তোমার সাথী
মোলায়েম ওই হাতটি ধরে,
দিচ্ছে গগন কখন পাড়ি
সাঁঝ আকাশে মেঘলা করে।
তোমার চোখে জলুক আগুন
ঠোঁটের কোনায় লালচে আকাশ,
পরশ পাথর ছুঁইয়ে দিলাম
সোনা মুখের এলাম ওপাশ
তুমি তখন দমকা হাওয়া
উথাল পাথাল বইছে বেগে
বৃস্টি ভেজা তোমার পায়ে
বন মহুয়ার গন্ধ লাগে
তখন দেখি সাঁঝ বাতিটা টিমটিমিয়ে
অরুপ রতন আশা করি দিচ্ছে আলো
বড় তোমায় বাসি ভালো।

Doubt : A Deadly Disease

Mrinmoy Mukherjee (Prof. English Dept.)

The Doubt, undoubtedly, is a doubtful word.
The invisible power of it is unimaginable.
The shapeless spirit floats like a winged bird
And builds its nest on small trees, unreasonable.
Let me be clear if it is positive or negative
Obviously depends on the nature of the mind.
But it's definitely inventive and fools are creative
Otherwise it can never blow like wanton wind.

Gradually in the heart it makes wound
And devours sleep, mental peace and rest
Gifting skelton body it furthers one to the under-ground.
And between two souls a wall it does erect.

O all mighty hearts! be rational and stout
Don't let everything go freely with doubt.

সত্য মানুষ

মধুমিতা ভূঞ্যা, প্রাক্তন ছাত্রী

রক্ত মানুষ থাকলেই কি
মানুষ, মানুষ হয়?
টাকা, পয়সা ধন দৌলতে কি
সত্য পরিচয়?
ভালো পোষাক পরলেই কি
ভদ্র হওয়া যায়?
আর মিষ্টি কথা বললেই কি
মান সম্মান পায়?
উচ্চ ঘরে জন্ম হলেই
সবাই বড়ো হয়?
মুচি ঘরে জন্ম হলে
সেও মানুষ হয়।
ধনী, গরীব, ফর্সা, কালো
আসল কথা নয়।
পরোপকার মন যার
তারই হবে জয়।

EDUCATION

Digbijoy Acharya

The best gift of life,
The world is now going to destruction.
Now we need proper instruction.
We all have to pay attention.
Because the only one way to live is education
To be honest and grateful
Education is very much useful
Man is the only one king of this kingdom.
To begin here properly we need wisdom.
Above all we have to have curiousity
Then will come prosperity.

দুঃখ

রশ্মি খাতুন (ইতিহাস বিভাগ)

দুঃখ? হু ---------- দুঃখ!
তুমি কি অনেক বড়ো?

তুমি পাহাড়ের মতো বড়ো হয়ে যাও।
কিন্তু তুমি জানো না আমি মানুষ,
আর তুমি আমার চেয়ে বেশি বড়ো হতে পারবে না।
তুমি সমস্ত পথ দিয়ে আমার জীবনকে দুঃখের অন্ধকারে ভরে দাও।
কিন্তু তুমি জানো না আমি মানুষ
আমি একটা পথ দিয়েই তোমার অস্তিত্বকে আগুনে
পুড়িয়ে, নিজের জীবনকে আলোতে ভরতে জানি।
তুমি যদি শপথ নিয়েছো আমার জীবনকে তছনছ করার
তাহলে আমিও চোখে আগুন নিয়ে ঘুরছি।
তোমাকে তাতে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেব।

স্মৃতি কথা

তাঞ্জিলা খাতুন (ইতিহাস বিভাগ)

ছাড়িব কেমনে তোমারে আমি তা জানিনা
ভুলিতে হবে তোমাকে আমি তা মানিনা।
অন্তরে থাকিবে তুমি আমার সর্বদাই
তোমার জ্ঞানের আলো যেন আমি পাই।
ছেড়ে যাওয়া দিনগুলো আমায় পিছু ডাকিবে
অন্তরে শিহরণ জেগে আমার মন কাঁদিবে।
যেখানেই যাই না কেন হৃদয়ে থাকিবে তুমি
তোমার পদতল সর্বদাই যেন শ্রদ্ধার সহিত নমি।
ভেঙেছে আমার অভিমান, দিয়েছ সম্মান
তোমাকে পেয়ে আমি নয় আর ম্লান।
ইচ্ছে করে তোমাকে কোনোদিনই না ছাড়বার
শুধু সঙ্গে থাকার।
সঙ্গে যদি না থাকে তোমার আশীর্বাদ
আমি কি করিতে পারিব শিক্ষার পথ পারাপার?

যোগ পরিচয়

ড. প্রশান্ত কুমার ভূঞ্যা (অধ্যাপক, শারীর শিক্ষা বিভাগ)

আবির্ভাবের বহু মতানৈক্য পরে
প্রাচীন ভূ-ভারতে মতের ঐক্য ধরে
খ্রীষ্ট পূর্ব প্রায় তিন হাজার অধিক অব্দ আগে
সভ্যতা সিন্ধু পারে,
অতঃপর সভ্যতা বৈদিকে বেদের
অংশ-গাথার আধার ধরে
আন্দোলন-শ্রমন বেয়ে
বৌদ্ধ-জৈনে ধরা পড়ে,
তন-মনের মিলনে মোক্ষ-কে লক্ষ্য করে
কর্ম, রাজ, ভক্তি ও জ্ঞানে-র সরণি ধরে
অষ্ট অঙ্গের রূপবেশে
যম-নিয়মে, আসন-প্রাণায়ামে
প্রত্যাহার-ধারনাতে, ধ্যান ও সমাধিতে সম্মোহন
যে করে 'যোগ' বলে তারে।
যে অভ্যাস, গঠনে বিয়োগের বৈপরীত্য ধরে
যে অভ্যাস, রিপুরে বিয়োগ করে
যে অভ্যাস, বিয়োগ ভোলাতে পারে
সে অভ্যাসকে 'যোগ' বলে সর্বস্তরে।
ধ্যান ধারণা সমাধির সহজ আয়ত্তীকরণ
অনুসরণ যে অভ্যাসে নাম তার ধ্যানাসন।
স্নায়ু-পেশীর সুগঠন, রোগের রোধন
অনুসরণ যে অভ্যাসে নাম তার স্বাস্থ্যাসন।
কুলকুন্ডলিনী-ষট্ চক্রে উপবেশন
আদ্যাশক্তি-প্রাণ শক্তির প্রেরণ।
ঘেরন্ড সংহিতার মুদ্রা কথন
কায়া-মনে অসীম আনন্দ লাভের অভ্যাস
অনুসরণ।
সার্বিক সত্ত্বায় কর্মক্ষম
সকল বাধায় উত্তরণ
আত্মপোলব্ধির যে দর্পণ।

মেদ শ্লেষ্মার প্রশমনে
জ্বরায় জীর্ণ মন্দির হতে কীট নিস্ক্রমনে
বিবেচনায় ষট্-কর্মণী পায় স্থান প্রাধান্যে
ক্রিয়া ষট্-এর বর্ণনা মেলে যোগ কথনে।
তন্ত্র-শ্বাসে, তন্ত্র-সংবহনে,
তন্ত্র-কর্মশক্তি শিরায় যখন প্রশান্তি প্রেরণে
আশ্রয় হয় প্রাণ অপান বায়ুর পরস্পরি সংযোগ
স্থাপনে
ক্রিয়া-শ্বাসে যা রেচক-পূরক-কুম্ভক কার্য সাধনে
সহজ লঘু বৈদিক রাজ যোগ প্রাণায়ামে।
বিকৃত দেহযষ্টির ভঙ্গি সংশোধনে,
মনো-শারীরিকে কৈশোর ও যৌবন ধর্ম পালনে,
আক্রান্ত ব্যাধিতে শরীর যখন আরোগ্যের সন্ধানে,
জ্বরাতে ভীত যখন বায়ুতে বিষ পানে
'শরীরম্ ব্যাধিমন্দিরম্' - বলে শনি যোগ কথনে।
হতে আশ্বস্ত শঙ্কিত মানব পৃথিবী যে উপায়
অন্বেষণে
যোগ দেয় সেই নিদান যা যোগাসনে।

পার্থিব ভোগ সংযম-যমে
মূল্যবোধ করি অর্জন - নিয়মে
সু-দেহাবস্থানের উপবেশন - আসনে
শ্বাসে বিরাম শ্বাসে নিয়ন্ত্রণ - প্রাণায়ামে
করি মোরা ইন্দ্রিয়ভাব সংবরণ - প্রত্যাহারে
উপলবিব্ধর আনয়ন একাগ্রতা বর্ধন - ধারণাতে
নিমীলিত নয়ন হই আত্মমগন - ধ্যানেতে
দেহবোধে অচেতন পরমাত্মায় মিলন - সমাধিতে
বন্ধনহীন রিপুমুক্ত স্বাধীন জীবন - তাই যোগ
অষ্টপথে।
শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ রূপে
পতঞ্জলি যোগ সূত্র-শ্লোকে
পুরাকালে শিক্ষককুল হৃদয় হতে

যে বাণী উত্থিত হয় লিখিত রূপে
যে দর্শন মনুষ্য আচার বিশ্লেষণে
খণ্ডিত হয় চার অধ্যায়েতেঃ
এক-এ বাহ্য জ্ঞান বিলয় - সমাধিপাদে
দু'য়ে যোগ অনুশীলন সাধনপাদে
তিনে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি পরিচয় - বিভূতিপাদে
চারে রিপু বন্ধনহীন মুক্ত জীবন - কৈবল্যপাদে

শতক উনবিংশর অন্তিমে ভারতলোকে
ভ্রান্ত ধারণা বিবদ্ধ করে যোগ-কে
শতক বিংশ'র প্রারম্ভে জাগাতে জাতীয়তাবাদকে
জাগাতে ক্ষয়িত মূল্যবোধের সমাজকে
বিজ্ঞান চক্রে অগ্রগামী যন্ত্রমনে
প্রয়োজন পড়ে সেই মানবমন্ত্র-কে
যে মন্ত্র পরিহার করে, 'নেওয়ার ভাব ভোগ'-কে
যে মন্ত্র স্বাগত জানায়, 'দেওয়ার ভাব যোগ'-কে।
ক্রমে যোগ অন্বেষণী মানব সত্ত্বা
উদ্বুদ্ধ হয় যোগ গবেষণাতে
মহামূল্যবান সম্পদের খোঁজ হয় এই যোগখনিতে।
গবেষণা যোগের মৌলিকত্বে
গবেষণা যোগের কর্মশীলতাতে
সকল গবেষণার আদি উন্মুক্ত দ্বার
মহারাষ্ট্রের কৈবল্যধামেতে।
ছাড়িয়ে কৈবল্যধাম
বিশ্বব্যাপী আজ যোগের সুনাম
বছর প্রতি জুন একুশে তাই যোগ-কে বিশ্ব সম্মান
অন্তিমে যোগ পরিচয়ে করি যোগ-কে প্রণাম।

শহিদ স্মরণে

অজয় দোলাই (ইতিহাস)

পালিয়ে গেল ব্রিটিশ সিংহ
নামিয়ে নিয়ে মাথা, নতুন রবি উদয় হল
গোলাম স্বাধীনতা।
স্বাধীন হওয়া সহজ তো নয়
প্রাণ নিয়েছো কত।
বীরের মরণ করেন বরণ
বীর ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী
আরও অনেক বীর।
দেশের জন্য জীবন দিলেন
উচ্চে তুলে শির।
মহাত্মাজীর 'ভারত ছাড়ো'
বীর নেতাজীর ডাকে।
প্রাণের মায়া ছেড়ে মানুষ
জুটল লাখে লাখে।
হিন্দুস্থানি ফৌজের বীর্যে
যখন পাকিস্তান হল স্তব্ধ,
যারা শহিদ হয়েছিল লড়াই ময়দানে
চিরদিন থাকবে তাঁরা মোদের স্মরণে।

Love in winter

Sarmila Pal, Dept. of English

We fall in love again and again,
When some old lovers break their love in pain.
We enjoy our loves and more it gain.
When in the time of winter, grass and dew drops make their love relation.
Just this time, we try to keep on focus our attention.
And finally we understand that it is our first love emotion.
Every wintry night we are waiting for each other.
Like night time calling the cricket forever.
Seasonal Rose spreads it sweet perfume everywhere.
And we make our loves bond stronger and brighter.
In this time some cloud covers the moonlit night
We caught our heart together very tight.
Between reality and imagination starting controversy and fight.
Cock crowing to remind that it's our last night.
Though it's very short time for our real life duration.
Are we all not be happy in our imagination.....?

স্বাধীনতা

মৃন্ময় মুখার্জী (অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ)

আমরা স্বাধীন একটাই দিন
এক বছরের একটি মাসে,
বাকি দিন সব শুধু কলরব
গিলে ফেলি দেশ গোগ্রাসে।
স্বাধীনতার আরেকটি দিন...
পনেরো তারিখ এল ফিরে
স্বাধীন হওয়ায় ভান করি চল
প্রতিবাদীর মুখোশ পরে।
মাইকে মুখ রাখলে, জোর —
কণ্ঠে আসে নেমে
সব কালো আলো খুঁজে যায়
'বন্দেমাতরম্'-এ।
দেশাত্ববোধক গানে মুখর
পরিবেশ চারিধার,
দেশাত্ববোধ অস্তমিত —
অন্ধকারে মনের দুয়ার।
ঐ যে যতীন... চৌষট্টি দিন
অনশনে, নির্বাসনে
তাঁর কথা আজ কে'ই বা ভাবে
কার মনে আর কে'ই বা জানে!
যে মেয়েটা জানেনা বাহির
মাড়ায় না চৌকাঠ,
কেমন করে শিখবে সে মা -
স্বাধীনতার সহজ পাঠ!
স্বাধীনতা মানেটা কী?
গায়ে মাখে, না মাথায়
স্বাধীনভাবে ক'জন বাঁচে
হাতড়ে হাতড়ে বেড়ায়।
পাসের বাড়ির ঐ ছেলেটা
যায় না মাঠে বিকেলবেলা,
বইয়ের পাতায়, লেখার খাতায় —
পড়া আর... পড়া-পড়া খেলা।
ও কি স্বাধীন নিজের কাছে?
কৈশোর তার মরে-বাঁচে
ক্লাস রুটিনে, হাই স্কোরিং এ
স্বাধীনতা আটকে গেছে।
রাতের বেলা অন্ধকারে
যে মেয়েটার কান্না শুনি
বুকের পরে নখের দাগে
থমকে যে যায় স্বদেশ বাণী।
ঐ মেয়েটাও স্বাধীন ছিল
স্বাধীনভাবে ফেলছিল পা
তার শরীরে নকশা করে
ঐ ছেলেটার স্বাধীনতা।
যে রক্তে স্বাধীনতা,
সেই স্বাধীনতায় রক্ত ঝরে
স্বাধীনতা, স্বাধীনতাকে আজ —
গলা টিপে খুন করে।
দেশটা স্বাধীন অনেক আগেই
মনটা স্বাধীন নয়,
মনে মধ্যে যে দেশ আছে
ভরা শুধু সংশয়।
দেশপ্রেম আজ পত্ পত্ পত্
নীলাকাশে হাওয়ায় দোলে
আমার মুক্তি চুক্তি করে
মদ, সিগারেট, মাংসের ঝোলে।
আমরা স্বাধীন একটাই দিন
এক বছরের একটি মাসে,
বাকি দিন সব হোক কলরব
স্বাধীনতা চাই বারোটি মাসে।

চিঠি

তারকনাথ দোলই (শিক্ষাকর্মী)

রোদ্দুর মাখা শিউলির গাছে, শিশির ভেজা ঘাসে
এলোমেলো হাওয়ায় ভাসে রাশি, রাশি
তোমাকে দিলাম সেই সেদিনের চিঠি।
ভাঙা, ভাঙা পদ্যে
কখনো বা গদ্যে
তোমাকে দিয়েছি যে চিঠি।
খামে মোড়া ভালোবাসা
অনেক দুঃখ ব্যথা
লুকিয়ে যত্নে লেখা।
ছেঁড়া চিঠি জুড়ে দিতেই স্বপ্নেরা মেলে ডানা
যেতে উড়ে ভেসে যেতে কেউ করেনি মানা।
ছাই-পাঁশ নেই মাথা
লিখেছি মনের কথা
বলোনা এভাবে তুমি
পাচ্ছি মনের ব্যথা।
ডায়েরির পাতা জুড়ে
তোমাকে জড়িয়ে ধরে
কতকাল ঘুমিয়ে যে চিঠি।

দুরাশা

সঙ্গীতা সাহু (অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ)

বটগাছের তলিন্দে নেমে আসে
শুঁয়োর মতো রাত্রিশোক।
ভোর হতে হতে...
নিস্তব্ধ সেই রাত অভ্যাস বশে
গতিপথ ভুলে বসে।
বাতাসে শুঁয়োর বিষবাষ্পের অনিমেষ জ্বালা
ত্বকের পরিধি জুড়ে কয়েকটা
কালো স্মৃতি।
ব্যথার জ্বরে বাদামি আর কষা।

আচমকাই ছুঁড়ে ফেলতে হয়
কিছু সময়ের জন্য
অদম্য কুণ্ঠিত প্রানটা।
হৃদয়ের বিবর্ণ কুমকুম রঙ
বদ্ধপরিকর আমাদের 'আমিকে' হারাতে।
রাত্রে নিয়নের আবছায়া আলেয়া
হিসেব নিতে চায় বার বার।
বেহিসাবী বেহাগী মন নিয়ে
তানপুরায় সুর তোলে গভীর নিঃসঙ্গতায়।
সান্ত্বনা আর বার্তাদলের আশ্রয়ে হয়তো
আবারো উপস্থিত হবে কোনো এক রাত!

মোগলমারির ইতিহাস

সুপ্রিতি মাইতি, ইতিহাস বিভাগ

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলির বেশিরভাগ দেখতে পাওয়া যায় বিহার ও উত্তরপ্রদেশের রাজ্যগুলিতে। তবে এবার আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মোগলমারিতে বৌদ্ধ প্রত্নস্থলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বৌদ্ধবিহার শব্দটি শুনলেই অবধারিতভাবে মনে আসে নালন্দার কথা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও যে এক বিশাল মহবিহারের অস্তিত্ব ছিল তা আমাদের অজানা। মোগলমারি আজ আর কোনো অখ্যাত গ্রাম নয়। ফাসিয়ান ও সুয়াং জাং এর লেখা থেকে জানা যায় বাংলায় অনেকগুলো বৌদ্ধ বিহার ছিল আর তার মধ্যে এটি একটি বৌদ্ধবিহার। মোগলমারি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন ১ নং ব্লকের অন্তর্গত দাঁতন শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রাম। এখানে আবিস্কৃত হয়েছে এক প্রত্নক্ষেত্র। এর বিস্তার বৌদ্ধ তাম্রলিপ্ত থেকে শুরু করে দন্ডভূমি (যা বর্তমানে দাঁতন) পর্যন্ত বিস্তৃত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক অশোক কুমার দত্তের নেতৃত্বে ২০০২ - ২০০৩ সালে এখানে খননকার্য শুরু হয়। গবেষকদের মতে এটি ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ শতকের একটি বৌদ্ধবিহার বলে অনুমান করা হয়। ২০১৩ সালে নভেম্বর মাসে বিস্তারিত ভাবে আরেকবার খননকার্য চালানো হয় এবং এই খননকার্যের ফলে বেশ কিছু সামগ্রীও পাওয়া গেছে এই বৌদ্ধবিহারটি গুপ্তযুগের সময়কাল বলা হয়েছে। আবার অনেক ঐতিহাসিকেরা বলেন এটিতে 'কুষান যুগের (১) চিহ্নও পাওয়া যায়। তবে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এটি পূর্ণরূপ পায় বলে মনে করা হয়। ''ষষ্ঠ শতকে (১২০০ খ্রীঃ) বলতে এটি নালন্দার সময়কাল ছিল।" ২

গবেষকদের মতে, মোগলমারি গ্রামটির আগের নাম ছিল অমরাবতী। পরবর্তীকালে এর নাম হল শখীসেনা ঢিপি। এই নামকরণের পেছনেও কিছু ঐতিহাসিক কারণ আছে। তৎকালীন অমরাবতীর রাজা ছিলেন বিক্রমকিশোরি। এই বিক্রম কিশোরির শখীসেনা নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল। সে যেই পাঠশালাতে পড়ত সেনাপতির ছেলে আহেমানিকোও সেই পাঠশালাতে পড়ত এবং তাদের মধ্যে একটি প্রণয় সম্পর্ক তৈরি হয়। এই ঘটনা রাজার কানে গেলে সেনাপতি তার ছেলে আহেমানিকোকে নিয়ে এই স্থান থেকে চলে যায়। এটি জানতে পেরে রাজকন্যা সেখানের একটি কুঁয়োতে ঝাঁপ দিয়ে মারা যায় সেই সময় থেকে এই জায়গাটার নাম হয় শখীসেনা ঢিপি। এই ঢিপিটি গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত পরবর্তীকালে এর নাম হল মোগলমারি। উড়িষ্যা থেকে ৩০ কিমি দূরে তুর্কা নামক জেলায় মোগল ও পাঠানদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। ওই যুদ্ধে মোগলদের বহু ক্ষয় ক্ষতি হয়। সেই থেকেই মোগলমারি নামের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। আবার এর আগে মোগলরা এর আশেপাশে আস্তানা পেয়েছিল। তার থেকেও এর মোগলমারি নাম হতে পারে।

সুবর্ণরেখা নদীতে প্রাচীন যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে বানিজ্য চলত। এই বিষয়টির উপর গবেষণা করতে গিয়ে ডঃ অশোক দত্ত ১৯৯৭-৯৮ সালে এই নদীর মোহনার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয় দাঁতন হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ইতিহাস প্রেমী নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের। তিনি তাকে এই স্থানের ঢিপির কথা জানান। ১৯৯৯ সালের দিকে তিনি এখানে আসেন। এটি পরিকাঠা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ''প্রাচীন ভারতের বিক্রমশীলা, সোমপুর, নালন্দা প্রভৃতি মহাবিহারের মতো এখানেও প্রচুর ভিক্ষু বাস করতেন।" ২০০৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর তরফ থেকে খনন শুরু হয়। মহাবিহারের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই মহাবিহারের প্রায় ২০০০ জন ছাত্র পড়াশুনো করত বলে অনুমান করা হয়। এখানে দেশ বিদেশের

ছেলেরা পড়াশুনো করত। এই বিহারটির কাছ দিয়ে সুবর্ণরেখা নদী বয়ে যেত। মগধ থেকে তাম্রলিপ্ত বন্দর যাওয়ার পথেই এই বিহারটির অবস্থান। তাই এই বিহারটিতে বণিকদের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে মনে হয়। সুতরাং বিদেশ থেকে ছাত্ররা আসত নদীপথের মাধ্যমে। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে নদীর গতিপথ বদলে গিয়ে 3 - 4 km দূরে সরে গেছে। খননকার্যের ফলে জানা যায় যে এখানে আবাসিক থেকে পড়াশুনোর ব্যবস্থা ছিল কারণ তাদের আবাসস্থল, খাবার পাত্র ইত্যাদি পাওয়া গেছে এবং শল্য চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল বলে অনুমান করা হয়। কারণ নানা রকম পশুর সিং দিয়ে তৈরি সুঁচ, ছুরি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এর থেকে জানা যায় শিক্ষাদানের সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা ছিল।

প্রত্নসমীক্ষার দ্বারা জানা গেছে গ্রামে একটি বিশাল প্রাচীন প্রত্নক্ষেত্রের উপর প্রত্নখননের মাধ্যমে মুকুট এবং ৯৫-টি ব্রোঞ্জ মূর্তি প্রভৃতি আবিষ্কার হয়েছে ''পাঁচটি ইটের ওপর অবস্থিত ত্রিরথ আচারের একটি জায়গার সন্ধান পাওয়া গেছে। পাঁচিল বেষ্টিত এই জায়গাটি সন্ন্যাসীদের একটি ছোট বাসস্থান ছিল বলে অনুমান করা হয়''। ৪ খননকার্যের ফলে প্রাচীন জিনিসের সঙ্গে আয়তকার ও বর্গাকার নির্মাণের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এগুলি ছোটো ছোটো ঘর মনে করা হয়। আরও খননকার্যের ফলে ৫৫ সেন্টিমিটার নীচে কাদার স্তর এবং তার নীচে কিছু কালো ও লাল রঙের সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও ৯০টি বৌদ্ধ মূর্তি। দিনে দিনে খনন করে পাওয়া গিয়েছে এবং ৫৪ রকমের পাথরের নকশা পাওয়া গিয়েছে বলে অনুমান।

২০০৬ - ০৭ সালে আরও গভীর খননকার্য শুরু হয়। এই খননকার্যের ফলে ফুল, পশু ও মানুষের ছবি আঁকা একটি দীর্ঘ দেওয়াল পাওয়া যায়। এই খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী হল স্লেট পাথরের নির্মিত একটি বৌদ্ধ মূর্তি। রজত সান্যালের মতে এই পর্যায়ে ''বৌদ্ধধর্মের দেবদেবীর'' পূজা শুরু হয়। কারণ খননকার্যের ফলে যে দেওয়ালগুলি পাওয়া গিয়েছে সেখানে জামবালা ও স্বরস্বতী দেবীর ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

ফা হিয়েন এর ফোক্ষ কিং গ্রন্থে ২২টি বৌদ্ধবিহার এবং হিউয়েন সাঙ এর "Si - yu - ki" গ্রন্থে ১০টি তার মধ্যে এই মোগলমারি বৌদ্ধবিহারটি একটি বলে মনে করা হচ্ছে। ভবিষ্যৎ -এ খনন করে আরও অনেক কিছুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে বলে অনুমান।

''আবুল ফজল এর শাসনকার্য সম্পর্কিত তৃতীয় খন্ডের নাম ছিল - ''আইন - ই - আকবর'' এটা থেকে আমরা মোগলমারি যুদ্ধের ইতিহাস জানতে পারি।'' ৫ প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিলুপ্তির কারণ হিসেবে মোগলমারিতে মোগল ও পাঠানদের যুদ্ধকেই দায়ী করেছেন।

তথ্যসূত্র –

১. অতীতের উজ্জ্বল ভারত — অংশুপতি দাশগুপ্ত, বতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।
প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স — ২০০৫, ফেব্রুয়ারি।

২. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস — সুনীল চট্টোপাধ্যায় (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ — ১৯৮৫, এপ্রিল)।

□ WEBSITE ঃ—

৩. https://www.bongodorshon.com/home/story-detail/buddhist-site-in-mogolmari.

৪. https://www.midnapore.in/article/Moghalmari-Buddha-Mahavihara-Buddhist- Monastery-Dantan.

৫. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/% Eo% A6% AE% Eo% A7% &B% Eo% A6% 97% Eo% A6% B2% Eo% A6% AE% Eo% A6% BE% Eo% A6% Bo% Eo% A6% BF.

আনন্দবাজার পত্রিকার থেকে কিছু তথ্য পায়।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেবী বর্গভীমা

অমৃতা মহাপাত্র (ইতিহাস বিভাগ)

দেবী বর্গভীমার ইতিহাস নানা ধরণের কিংবদন্তীতে ঘেরা। এই সকল কিংবদন্তীকে দু-ভাগে (প্রাচীন যুগের কিংবদন্তী ও মধ্যযুগের কিংবদন্তী) ভাগ করে আলোচনা করলে দেবী সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্ত আসা সম্ভব হবে।

প্রাচীন যুগের কিংবদন্তী প্রসঙ্গে প্রথমেই জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবীর আত্মপ্রকাশের কথা উল্লেখ করা চলে। কিংবদন্তী থেকে জানা যায় ঘটনাটি ঘটে মহাভারতের যুগে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে। কিংবদন্তীটি হল ঃ মহাভারতের যুগে তাম্রলিপ্তে যখন ময়ূরবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন তখন এই বংশের দ্বিতীয় রাজা তাম্রধ্বজের নিয়োজিত এক জেলে বৌ প্রত্যহ রাজ পরিবারের মাছ সরবরাহ করত। একদিন একটি বনের মধ্য দিয়ে সঙ্কীর্ণ রাস্তায় মাছের ঝুড়ি নিয়ে রাজবাড়ীতে আসার পথে সে একটি ছোট জল ভরা গর্ত দেখতে পায়। স্বভাববশত সেখান থেকে কিছুটা জল নিয়ে মাছের ঝুড়িতে দেয়। আশ্চার্যের ঘটনা হল, জলছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়ির মধ্যকার মরা মাছ গুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই অলৌকিক ঘটনার কথা রাজার কানে যায় এবং তিনি একদিন জেলে - বৌ সহ অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে স্থানটি দেখার জন্য যান এবং জলে ভরা গর্তের জায়গায় একটি বেদী এবং তার উপরে তিন মূর্তি দেখতে পান। রাজার তাম্রধ্বজ সেই দৃশ্য দেখে সেখানে দেবী পুজার ব্যবস্থা করে দেন। ১ সেই দেবীই বর্গভীমা নামে পরিচিত হয়ে পূজিত হয়ে চলেছেন।

এই কিংবদন্তীর রকমফেরও শোনা যায়। ময়ুরবংশীয় চতুর্থ রাজা গরুড়ধ্বজ প্রত্যহ শোল মাছ খেতেন। একজন জেলে তা সরবরাহ করত। একদিন জেলের মধ্যে শোল মাছ সংগ্রহকরা সম্ভব না হওয়ায় রাজা তাকে মৃত্যু দন্ডের আদেশ দেন। জেলে কোন রকমে জঙ্গলে পালিয়ে যায় এবং সেখানে দেবী বর্গভীমা নামে পরিচিত হয়ে পূজিত হয়ে চলেছেন। তাকে যত বেশী সম্ভব শোলমাছ জোগাড় করে শুকিয়ে রাখার এবং সেই শুকনো শোলমাছ প্রত্যহ রাজবাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার সময় দেবী কর্তৃক নির্দিষ্ট একটি কুয়ো থেকে জল ছিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ঐ নির্দিষ্ট কুয়োর সন্ধানও দেবী জেলেকে দেন এবং বলেন যে, ঐ কুয়োর জল ছিটালেই মরা মাছ বেঁচে উঠবে। জেলে তাই-ই করতে শুরু করে এবং রাজার কাছে সময়ে অসময়ে শোল মাছের যোগান দেওয়ার আর কোন অসুবিধে হয় না। এদিকে রাজার সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত জেলের কাছ থেকে সেই অলৌকিক কুয়োর সন্ধান লাভ করেন। রাজা সেই দেবী মূর্তির স্থায়ী আবাসস্থল হিসেবে সেখানে একটি মন্দির তৈরি করিয়ে দেন। ২

প্রাচীন যুগের দ্বিতীয় কিংবদন্তীটি হল, দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা কর্তৃক দেবীর মন্দির নির্মাণ। ৩

আবার, মধ্যযুগের কিংবদন্তীগুলি লক্ষ্য করলে এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মধ্যযুগেই দেবীর আবির্ভাব বিশেষ করে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মধ্যযুগের প্রথম কিংবদন্তীটি হল, চন্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক ধনপতি সওদাগর একসময় রূপনারায়ণের উপর দিয়ে বাণিজ্য তরী নিয়ে সিংহলের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য করতে যান। সেই সময় তিনি তমলুকে নোঙর করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি লক্ষ্য করেন, একজন লোক একটি সোনার কাসী নিয়ে যাচ্ছে। কৌতুহলী হয়ে তিনি জানতে চান, কোথা থেকে এটি পেয়েছেন। লোকটি তখন একটি বিস্ময়কর কাহিনী তুলে ধরেন। বললেন, জঙ্গলের মধ্যে একটি আশ্চার্য জলক কুয়ো রয়েছে, সেখানকার জলে পেতলের পাত্র ডোবালেই তা সোনার পাত্র হয়ে যায়।

ব্যবসায়ী ধনপতি লোকটির কাছ থেকে সেই কুয়োর সন্ধান নিতেন তারপর তিনি তমলুকের বাজারে যত পেতলের পাত্র ছিল তা কিনে নিলেন। কুয়োর জলে সেগুলি ডোবাতে হাতে হাতে ফল পেলেন। সব পাত্রই সোনার হয়ে গেল। সেই সব সোনার পাত্র সঙ্গে নিয়ে তিনি সিংহল যাত্রা করলেন এবং সেখানে সেসব পাত্র বিক্রি করে প্রচুর অর্থলাভ করলেন, যা তিনি কখন কল্পনাও করতে পারেননি। ফেরার সময় এল, সেই সময় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর মনে পড়ল তমলুকের আশ্চর্য কুয়োর কথা। তমলুকে তিনি তাঁর বাণিজ্যতরী থামালেন। কৃতজ্ঞতা নিদর্শন স্বরূপ সেই কুয়োর উপরই তিনি বর্গভীমা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই মন্দিরটি হল বর্তমানের বর্গভীমা মন্দির।

মধ্যযুগের দ্বিতীয় কিংবদন্তী হল, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর তমলুকের কৈবর্ত রাজপরিবারের কালু ভূঞ্যা। ৪

এই সকল কিংবদন্তীগুলি অনুসরণ করলে বোঝা যায়, বাংলা তথা ভারতের অগনিত লৌকিক দেব-দেবীর ন্যায় দেবী বর্গভীমাও একান্তভাবে এবং স্থানীয় লৌকিক দেবী। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটি যুক্তি উপস্থিত করা যায়।

প্রথমত ঃ কোন মূল সংস্কৃত পুরানে বা প্রাচীন কোন সংস্কৃত পুস্তকে দেবীর উল্লেখ নেই। ৫

দ্বিতীয়ত ঃ দেবী বর্গভীমার পূজায় ব্যবহৃত ধ্যানমন্ত্র কোন সংস্কৃত পুস্তকে পাওয়া যায় না।

দেবী মন্দির

বাংলাদেশে আজও যে কয়েকটি মন্দির স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তাদের অন্যতম হল আমাদের আলোচ্য দেবী বর্গভীমা মন্দির। এটি রূপনারায়ণের পশ্চিম তীরে শহরের পাশেই অবস্থিত। মন্দিরটির গঠনরীতি আজও আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। তাই ঐতিহাসিক হান্টার এই মন্দিরটির বর্ণনা প্রসঙ্গে নিয়েছেন। এর গঠন শৈলীর নৈপুণ্য ও কৌশল আমাদের বিশেষ ভাবে চমৎকৃত করে। খুব উঁচু বুনিয়াদের উপর তিন ভাঁজ দেওয়ালের দ্বারা মূল মন্দিরটি তৈরি করা এবং এরই উপর তিন ভাঁজ দেওয়াল অবস্থিত। তিনটি পৃথক দেওয়ালের সমষ্টিতেই মন্দিরের পূর্ণ দেওয়ালে রয়েছে। মন্দিরটি গোল ছাদ বিশিষ্ট। মন্দিরটি করতে গিয়ে অনেক বড় বড় পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। যে যুগে যন্ত্রের প্রয়োগ অজানা দিন সেই যুগে এত বড় বড় পাথর কিভাবে যে মন্দির নির্মাণের কাজে লাগানো হল তা ভাবলে আজও আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। ৬

মন্দিরটি পশ্চিমমুখী এবং বর্তমানে মন্দিরটির চারটি বিশিষ্ট অংশ চোখে পড়ে — ১. মূল মন্দির যেখানে তথাকথিত দেবী বর্গভীমাসহ অন্যান্য দেবদেবীর প্রস্তরমূর্তির (পরবর্তীকালে স্থাপিত) অবস্থান। এটিকে বলা হত বড় দেউল। ২. জগমোহন অর্থাৎ যেখানে দাঁড়িয়ে দর্শকরা দেবীকে দর্শন করেন ও ভক্তি জানান। ৩. যজ্ঞমন্দির অর্থাৎ যেখানে যজ্ঞ ও হোম হয় এবং ৪. প্রশস্ত নাটমন্দির বা নাট্যমন্দির অর্থাৎ যেখানে পালাগান নামকীর্তন ইত্যাদি হত। নাটমন্দির চারিদিক খোলা, উপরে ছাদ দেওয়া, মন্দিরের দক্ষিণদিকে রয়েছে তিনটি ঘর — একটিতে মায়ের ভোগ তৈরি হয়, মাঝের ঘরটি আয়তনে বড় ও এটি যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অপরটি পুরোহিতদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট। মন্দিরের উত্তরদিকে মন্দির এলাকার মধ্যে রয়েছে একটি গুলঞ্চ গাছ যেটির সঙ্গে দেবীর বিশেষ সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। বন্ধ্যা নারীরা সন্তান কামনায় এই গাছটিকে পূজা করে থাকেন। উত্তরদিকে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে একটি পুকুর, যেটি মায়ের কুন্ডু বলে পরিচিত। অনেক দর্শনার্থী এখানে স্নান করে মায়ের কাছে পূজা দেন। পুণ্য অর্জনের জন্য বা মনস্কামনা পূরনের আশায় মায়ের কুন্ডে নারী পুরুষ স্নান করেন। শোনা যায়, মন্দিরের পশ্চিম দিকে বর্তমানে সেখানে দিয়ে দর্শনার্থীরা আসা যাওয়া করেন যেখানে পূর্বে দেওড়ি

ছিল এবং তার উপরে ছিল নহবৎখানা - যেখানে বসে বাদ্যকারেরা নানারকম বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বাজনা পরিবেশন করত। বর্তমানে দেউড়ি নেই; তবে প্রবেশপথের দু'ধারে একটি করে ছোটো পাকঘর রয়েছে। বাঁদিকেরটি সম্প্রতি অফিসঘর রূপে ব্যবহৃত হছে। অতীতে মন্দিরের একেবারে পূর্বপাশে ভোগখানা ছিল বলে শোনা যায়। বর্তমানে সে জায়গায় দু'টি মিষ্টির দোকান রয়েছে, যেখানে থেকে দর্শনার্থীরা মিষ্টি কিনে মায়ের ভোগ দেন।

বর্গভীমা মন্দিরের সবচেয়ে প্রাচীন অংশ বড় দেউল। এটিকে যে একাধিকবার সংস্কার করা হয়েছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বিষ্ণুচক্রের মত একটি চক্র মন্দিরের শিখরে রয়েছে। বড় দেউল 'সপ্তরথ' রীতিতে নির্মিত। ৭ মন্দিরের গর্ভদেশে পূর্ব দিকের দেওয়াল ঘেঁষে উঁচু বেদীর উপর পাথরে খোদাই দেবীমূর্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে হিন্দু দেব-দেবীর ২৬ টি টেরাকোটা চিত্র রয়েছে। এই টেরাকোটা (পোড়ামাটির চিত্র) গুলির মধ্যে ''রামসীতা, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ, চতুর্মুখী ব্রহ্মা, মূষিক বাহন গনেশ, চতুর্ভুজা সিংহ বাহিনী, কার্তিক, বীণাহস্তা সরস্বতী, শিব-দুর্গা, রামচন্দ্র, লীলা-পদ্মহস্তা নায়িকা, বকাসুরবধ, মকরবাহন গঙ্গা আনয়ন প্রভৃতি চিত্র আছে।

এই উভয় অনুমান থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, আমাদের আলোচ্য মন্দিরটি আদিতে বর্গভীমা দেবীর মন্দিরটি আসলে বৌদ্ধ বিহার টি কি হিন্দু মন্দির ছিল, তা আরও তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে মন্দির স্থাপত্য শৈলীর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, এর রেখ দেউল স্থাপত্যরীতিটি বহিরাগত; এটি বাঙালী মণীষার নিজস্ব সৃষ্টি নয়। 'নাগর' শৈলীটি উত্তর ভারতীয় বিশেষ করে।

দেবীর পূজায় ব্যবহৃত ধ্যানমন্ত্র

যে ধ্যানমন্ত্রটি দেবী পূজায় ব্যবহৃত হয়, তা হল ঃ—

কৃষ্ণবর্ণাং চতুর্ভুজাং মুন্ডমাল বিভূষিতাং।
দক্ষিণে খড়গমূলঞ্চ তীক্ষ্ণধারা দূরাসদম্;
বামে খর্পরমুন্ডঞ্চ লোলজিহ্বা ত্রিলোজনা।
ব্রাঘ্রচর্ম পরিধীরাং ভীমাদেবী শবাসনা।।

ভারতের মানুষ যে সেই সুদ্দর অতীত থেকে দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী, তাও আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। ধন্য ভারতবাসী, ধন্য তার চিন্তার জগৎ।

তথ্যসূত্র (Sources)

১। উমাচরণ অধিকারী ঃ তমলুকের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ, ২য় মুদ্রণ, পৃঃ ১৬ - ১৭।
২। ডব্লিউ.ডব্লিউ.হান্টার ঃ এ স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল, ভলিউম -৩ লন্ডন, ১৮৭৫, পৃঃ ৬৪।
৩। উমাচরণ অধিকারী ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯।
৪। মহেন্দ্রনাথ করণ ঃ হিজলীর মসনদ-ই আলা, ১৯৫৮, পৃঃ ৪১।
৫। নগেন্দ্রনাথ বসু ঃ সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে তমুলুক প্রসঙ্গে আলোচনা অংশে দেবী বর্গভীমার উল্লেখ রয়েছে।
৬। হান্টার, ডব্লিউ, ডব্লিউ এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অববেঙ্গল, ভলিউম - তিন, লন্ডন ১৮৭৫, পৃঃ ৬৫
৭। প্রণব রায় ঃ মেদিনীপুর জেলার প্রত্ন-সম্পদ ১৯৮৬, পৃঃ ১৪৬

একটি বৃষ্টির দিনের অভিজ্ঞতা

রিম্পা শাসমল, (শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ)

আমি গতকাল বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে টিউশান পড়তে গিয়েছিলাম। তারপর পড়তে পড়তে দেখেছিলাম আকাশে ঘন কালো হয়ে মেঘ উঠেছে। পড়া শেষ করতে করতে প্রায় ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে হওয়ার জন্য আমি টিউশানে বসেছিলাম। সেই দিন আমার এতটাই দুর্ভাগ্য হয়েছিল যে কেউ টিউশান পড়তে যায়নি এবং ঝড়-বৃষ্টি বন্ধ হওয়া পর্যন্ত টিউশানে বসে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। ঝড়-বৃষ্টি কমতে আমাকে টিউশন থেকে কোন মতে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল এবং ভেবেছিলাম আমি একা বাড়ি ফিরে যেতে পারব! কিন্তু সেই দিন আমি তাড়াহুড়ো করে টিউশান থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। রাস্তার অবস্থাটা খুবই খারাপ ছিল। ঘন অন্ধকার ও রাস্তার পাশে বড়ো ঝোপের মতো গাছ থাকায় কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। এমনকি ওই রাস্তার ধারে বড়ো জোর একটা দুটো বাড়ি ছিল তাও রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে অবিস্থত। বাড়ি ফিরে আসার সময় অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলাম, যে অনেক গাছ ভেঙে পড়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে একটা ঝোপ থেকে আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। তখন আমাকে খুব ভয় লেগেছিল। তারপর মনে হল টর্চ নেই তো কি হয়েছে আমার কাছে একটি মোবাইল রয়েছে। তারপর মোবাইলের টর্চ জ্বেলে সেই আলোর সাহায্যে ওই আওয়াজের রহস্য সমাধানের জন্য এদিক ওদিক খোঁজা খুঁজি করছিলাম। খোঁজা খুঁজি করার সময় কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম যে একটি কুকুরের গায়ের ওপর গাছের ডাল ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। তারপর মোবাইলের টর্চের আলো দেখে কুকুরের গায়ের পড়ে থাকা গাছের ডাল সরিয়ে ফেলেছিলাম। গায়ের ওপর ডাল পড়ে যাওয়ায় কুকুর তার নিজের স্থানে ফিরে যেতে পারেনি। তাই আমি নিজের বাড়িতে এনেছিলাম ও সেবা করেছিলাম এবং ওকে সুস্থ করে পোশা কুকুরে পরিণত করেছিলাম। তারপর ওকে আমার প্রিয় বন্ধুর জায়গাটা দিয়েছিলাম এবং ওর নাম দিয়েছিলাম শিরু।

এই বৃষ্টির দিনের অভিজ্ঞতাটা ছিল এক নতুন, আলাদা রকমের। আর আমি আমার প্রিয় বন্ধু পেয়েছিলাম।

ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

মিতালী পাঁজা (প্রাক্তন ছাত্রী)

প্রতিদিনের কাজের ভারে অবসন্ন মানুষ মুক্তি খোঁজে। এই মুক্তি হতে পারে পাহাড় চূড়ার টানে ছুটে চলায় কিংবা কান পেতে সমুদ্রের গর্জন শোনার মধ্যে, আবার তা হতে পারে একদিনের কোন আনন্দ আয়োজনেও। পিক্‌নিক ও বনভোজন এসবই সেই আনন্দের আয়োজন। এই আনন্দের স্বাদ আমিও পেয়েছি সম্প্রতি।

আমাদের ও কাকুদের বাড়ির সকলে মিলে ঠিক হয়েছিল এবার বনভোজন হবে উঃ চব্বিশ পরগণার টাকিতে। প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন নিতাইকাকু। বাবা বলেন ইচ্ছামতীর ধারে টাকি একটি বহু পুরানো জনপদ। বারো ভুইঞার অন্যতম প্রতাপাদিত্য নাকি মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এখান দিয়েই গিয়েছিলেন। শুনে আমিও ভাই রোমাঞ্চিত হয়ে বলে উঠি — বিভূতিভূষণের ''ইচ্ছামতীর সঙ্গে দেখা হবে তবে?'' সমস্ত কিছু ঠিক হয় এবং রাঁধুনি ও বাকি সমস্ত ব্যবস্থা করা হবে টাকি থেকেই। অতএব পঁচিশে ডিসেম্বর গন্তব্যস্থল টাকি।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই বাবা তাড়াহুড়ো করছে আর গাড়িতে গিয়ে বসতে বলছে। আমি, বাবলুদাদা আর ভাই একদিকে বসলাম আর বাবা, মা, কাকু ও কাকিমা অন্যদিকে বসেই গল্প শুরু করেছে। গাড়ি কিছুটা যাওয়ার পর দুপাশে সবুজ, মাঝে মাঝে সোনালি রঙের ধানক্ষেত, কিছুক্ষণ যাওয়ার পর সঙ্গীতা বউদিদি গান ধরেছেন— ''আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।''

সেই অর্থে যাকে গ্রাম বলা হয় টাকি কিন্তু তা নয়। পাকা রাস্তা, স্কুল কলেজ, লাইব্রেরি সবই আছে। কিছু সবুজ প্রকৃতি আঁচল দিয়ে যেন সবই ধরে রেখেছে। গাড়ি থেকে নেমে আমরা পৌঁছালাম আমাদের গন্তব্য— শচীন্দ্রসরণীতে। আম, নারকেল গাছ দিয়ে ঘেরা সাজানো প্রাঙ্গণ, রান্নার একটা উনুন। রাঁধুনি ঠাকুমা আগেই চলে এসেছিল তাই পৌঁছেই গরম গরম পকোড়া ও কফি পেয়ে গেলাম। তারপর ঘুরে বেড়ালাম। মন কেড়ে নিল ইচ্ছামতী। নিস্তরঙ্গ শান্ত রূপালী জল। ইতস্তত নৌকা তবে কানে লাগছিল যন্ত্রচালিত নৌকার বিকট শব্দ। একটি নৌকা ভাড়া করে আধঘন্টা নদীতে ঘুরলাম। ফিরে এসে কিছুক্ষণ ক্রিকেট খেললাম। ঠিক দেড়টায় খাওয়া-দাওয়া শুরু হল। ইছামতীর পারশে মাছ ভাজার স্বাদ যেন জিভে জল এনে দেয়। তবে ইলিসের পাতুরি ও মাটন কসাও সুস্বাদু হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া করে ইতস্তত ঘুরলাম। বাবলুদাদা নলেন গুড়ের পাটালি কিনল সেটি বেশ ভালোই খেতে।

ঠিক সাড়ে পাঁচটায় গাড়িতে বসলাম। একরাশ মনখারাপকে সঙ্গী করে টাকিকে বিদায় জানালাম। আমার কলেজ, পড়ার চাপ, মায়ের বক্‌বক্‌, বাবার অফিস এই সবের মধ্যে মন যখন হাঁপিয়ে উঠবে তখন বনভোজনের এই স্বর্নালী মুহূর্তগুলো মনের মধ্যে ইচ্ছামতীর মুক্ত বাতাস বইয়ে দেবে। হঠাৎ করে খুঁজে পাব আনন্দ অনাবিল সেই স্মৃতিতে।

পাথরা

মিতা জানা (প্রাক্তন ছাত্রী)

৩৪ টি মন্দিরে গাঁথা ঃ—

বাংলার মন্দির নগরীর কথা উঠলেই যে দুটি স্থানের নাম আগে উঠে আসে তা হল বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ও বর্ধমানের কালনা। তবে এদেরকে ছাড়াও গ্রাম বাংলায় রয়েছে আরও এক মন্দিরময় গ্রাম পাথরা। কলকাতা থেকে ১৪০ কিলোমিটার পশ্চিমে কাঁসাই নদীর তীরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একটি ছোটো গ্রাম হল পাথরা। পাথরা বিখ্যাত মন্দিরের বৈচিত্র্যের কারণে।

পাথরা গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে 34টি টেরাকোটার মন্দির। দুর্গাচালান, রাসমঞ্চ, জমিদারের কাছারি বাড়িসহ একাধিক ঐতিহ্যের নিদর্শন। এছাড়াও মন্দিরে বাংলার চালা, রত্ন, দালান, দেউল মঞ্চ সমস্ত রীতিরই মন্দির দেখতে পাওয়া যায়। পাথরায় 1700 - 1800 শতাব্দীতে মন্দির তৈরি শুরু হয়। পাথরায় গেলেই দেখা যায় কয়েকটি মন্দিরের গায়ে 1721 এবং 1749 শকাব্দ খোদাই করা রয়েছে। পাথরা মানেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্যের পীঠস্থান।

এই পাথরার গ্রাম থেকে পাওয়া গেছে মহাযানী বৌদ্ধ দেবতা লোকেশ্বর ও ব্রাহ্মণ দেবতা বিষ্ণু। এই দুইয়ের সংমিশ্রনে নির্মিত মূর্তি। স্থানীয় ইতিহাস সম্পর্কে কিং ইয়াসিন পাঠান জানান যে মূর্তিটি পাওয়া যায় 1961 খ্রিষ্টাব্দে। বর্তমানে এই মূর্তিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

তখন বাংলার নবাব ছিলেন আলিবর্দী খাঁ। তিনি বিদ্যানন্দ ঘোষালকে নিযুক্ত করেন রতনচক পরগণার কর আদায়ের জন্য। বিদ্যানন্দ ঘোষাল ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। কর আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে পাথরা গ্রামে কংসাবতী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠা করেন এক মন্দির। তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা শুরু হলো। মন্দির প্রতিষ্ঠার কারণে বিদ্যানন্দের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই কাজে নবাব আলিবর্দী খাঁ মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। রাজস্বের টাকা ঠিকঠাক জমা না দিয়ে সেই টাকা তিনি মন্দির নির্মাণে ব্যয় করেছিলেন। এই কারণে নবাব তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান ও মৃত্যুদন্ড দেন। নবাব আদেশ দিলেন তাঁকে পাগলা হাতির সামনে ফেলে দেওয়া হোক, যাকে হাতির পদতলে বিদ্যানন্দ পিষ্ঠ হয়ে মারা যান। এরপর নবাবের সৈন্যরা নিয়ে আসেন রতনচক পরগণার। ঢাঁক ঢোল পিটিয়ে এলাকা বাসীদের জানিয়ে দেন যে বিদ্যানন্দ সময়মতো খাজনা রাজ দরবারে পাঠাননি এবং ভবিষ্যতে এমন কোনো ঘটনা না ঘটে তা ই নবাবের আদেশ যে তাঁকে পাগলা হাতির সামনে ফেলে দেওয়া হবে।

কথিত আছে, বিদ্যানন্দকে হাত পা বেঁধে মাঠের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু পাগলা হাতি বিদ্যানন্দকে পরপর তিনবার পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আবার আর একটি হাতি বিদ্যানন্দের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে, শত চেষ্টাতেও হাতি পা ওঠাতে রাজি হয় না। এমন ঘটনা দেখে নবাবের সৈন্যরা ছুটে যান রাজ দরবারে, সঙ্গে নিয়ে গেলেন বিদ্যানন্দকে। বিদ্যানন্দ তাঁর গুরুদেবের আদেশ দেওয়া ঘটনাগুলি জানালেন। সমস্ত ঘটনা শুনে নবাব বিদ্যানন্দের শাস্তি মুকুব করেন। এবং তাকে রতনচক পরগণার দান করে দেন। নায়েব থেকে জমিদার পড়ে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বিদ্যানন্দ আগের থেকে আরও অধিক পরিমানে সেবামূলক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সন্তান রত্নেশ্বর এই রতনচক পরগণার জমিদার হিসাবে নিযুক্ত হন। রত্নেশ্বর ঘোষাল নবাবের কাছ থেকে মজুমদার উপাধি পান। ঘোষাল হয়ে যায় মজুমদার। রত্নেশ্বর তার বাবার

স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখবে রতনচক পরগণার নাম পরিবর্তন করলেন। ওই যে পাগলা হাতির পায়ে চাপা পড়া থেকে বিদ্যানন্দ বেঁচে গেলেন সেই স্মৃতিকেই স্মরণীয় রাখতে নাম রাখলেন 'পাতরা'। অর্থাৎ 'পা থেকে উৎরে যাওয়া। আর এই পাতরা কালের অপভ্রংশে হয়ে দাঁড়াল 'পাথরা'। ক্রমে পাথরা মন্দির নির্মাণের কাজ বিদ্যানন্দের বংশধররা এগিয়ে নিয়ে যান।

আঠারো শতকের শেষে মন্দির নির্মাণ থেমে গেল। কারণ এই ধনী পরিবার ক্রমশ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র গমন করা শুরু করেন। ক্রমে পাথরা গ্রাম ও তাম্রলিপ্ত বন্দর কালের নিয়মে গুরুত্ব হারাল। বন্দরের মতো মন্দির গুলিও পরিত্যক্ত হয়ে গেল। মন্দিরগুলিতে যথেচ্ছ লুটপাট শুরু হলো। অনেক মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো। বাঁচিয়ে রাখা গেছে 34 টি মন্দির। বাঁচানোর ক্ষেত্রে পাশের গ্রামের ইয়াসিন পাঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়েও মন্দির রক্ষার উদ্যোগ নেওয়ায় স্বধর্মের মানুষদের বিরূপতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাকে মৃত্যুর হুমকিও পর্যন্ত শুনতে হয়েছে। কিন্তু হার মানেন নি ইয়াসিন পাঠান। 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া' (ASI)- কে উপলব্ধি করাতে সক্ষম হন। ফলত আজ 34 টি মন্দিরের মধ্যে 28 টি মন্দির ASI এর তত্ত্বাবধানে এবং ইতিমধ্যেই এই সংস্থার 28 টির মধ্যে 18 টির যথাযথ পদ্ধতি মেনে সংস্কার করেছেন।

এছাড়াও ইয়াসিন পাঠান এবং স্থানীয় গ্রামগুলির হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষদের পাশে নিয়ে 1986 সালে গঠিত হয় একটি বেসরকারি সংস্থা। Pathra Archaeological Preservation Committee এই কমিটি মন্দিরগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করে। 1960 সালের মধ্যভাগ থেকেই মন্দিরগুলি সরকারী সাহায্যে ও আই আই টি খড়গপুরের কারিগরি সহায়তা পেতে শুরু করে। আর ইয়াসিন পাঠান যিনি স্থানীয় একটি স্কুলে পিয়নের চাকরি করতেন। সরকারের থেকে 1994 সালে তাঁর অসামান্য প্রয়াসের জন্য সম্মান পান।

পান্ডুরাজার ঢিবি

মিতা সাউ

কথায় বলে জলে সব কিছু ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যায়। কিন্তু কে বলবে যে বন্যার জল একটা হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসকে তুলে আনবে। বন্যার জল যে ইতিহাস আমাদের সামনে তুলে এনেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলো পান্ডুরাজার ঢিবি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রত্নতাত্ত্বিক প্রায় 4000 বছরের প্রাচীন স্থলের নাম হল পান্ডুরাজার ঢিবি। পান্ডু রাজার ঢিবি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সদর মহকুমার অন্তর্গত আউস গ্রাম থানার রামনগর পঞ্চায়েত এলাকায় অজয় নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পান্ডুক গ্রামের পুবার পান্ডুক দীননাথপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে 5 মিটার ঢিবির উপর অবস্থিত স্থানটি পান্ডুরাজার ঢিবি নামে পরিচিত। পান্ডুরাজার ঢিবির স্থানীয় নাম রাজা পোঁত ডাঙা। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস এখানেই মৃত রাজাদের সমাধিস্ত করা হত। এছাড়া এটিই পশ্চিমবঙ্গে আবিষ্কৃত প্রথম তাম্রযুগীয় প্রত্নক্ষেত্র। পান্ডুরাজার ঢিবির প্রধান ধ্বংসস্তূপটির সঙ্গে মহাভারতের রাজা পান্ডুর নামের যোগসূত্র পাওয়া যায়।

বাংলার মাটিতে বাঙালি প্রথম কবে ঘরবাড়ি বানিয়ে থিতু হয়েছিল সে বিষয়ে পন্ডিত মহলে তর্ক বিতর্কের অন্ত নেই। তবে বর্ধমানের পান্ডুরাজার ঢিবি থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় খ্রিষ্টজন্মের কয়েক হাজার বছর আগেও বাঙালির শিকারজীবী থেকে কৃষিজীবী হওয়ার নজির ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। রাঢ় বাংলার কেন্দ্রভূমি বর্ধমানের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ইতিহাসের নানা উপাদান। বিভিন্ন স্থানে খনন কার্যের মাধ্যমে জানা গিয়েছে রাঢ়বঙ্গের অজয়-দামোদর বিধৌত অঞ্চল অতি প্রাচীন। এই এলাকায় প্রায় দশ হাজার বছর আগে ধারাবাহিক ভাবে মানব গোষ্ঠী বসবাস করত। এই এলাকাতেই যে লৌহ পূর্বযুগ এবং লৌহযুগের সূচনা হয়েছিল তার নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছে। শুধুমাত্র খনন কার্যের প্রাপ্ত নিদর্শন নয়, বিভিন্ন সাহিত্য এবং ধর্মগ্রন্থেও এই স্থানটির উল্লেখ আছে। বর্তমানে গ্রামটিতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, বাগদী, বাউরি, মুচি, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করেন।

বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে জানা যায় পান্ডুরাজার ঢিবি এবং সংলগ্ন অঞ্চল ঘিরে এক সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য শহরের পতন ঘটেছিল। পান্ডুরাজার ঢিবির দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় 200 মিটার এবং প্রস্থ প্রায় 170 মিটার এবং উচ্চতা 5 মিটার। এটি বর্ধমানে আবিষ্কৃত প্রথম তাম্র প্রস্তরযুগীয় প্রত্নস্থল। পান্ডুরাজার ঢিবির মধ্যপ্রস্তর যুগীয় প্রত্নস্থল রীরভনপুরের প্রায় 40 কিমি উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব রেলের সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে ভেদিয়া রেলস্টেশান থেকে গ্রামটির দূরত্ব 11 মিটার। ভৌগোলিক মানচিত্রে ঢিবিটির অবস্থান 23.25 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং 87.39 ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

জনশ্রুতির আড়ালে পান্ডুরাজার ঢিবি সম্পর্কে একটি আখ্যানে বলা হয় শাক্যবংশী রাজা পান্ডু পারিবারিক কলহে ক্লান্ত ও ক্ষুব্ধ হলে কপিলাবস্তু ত্যাগ করে রাঢ় বাংলার মধ্যস্থান হুগলির পান্ডুয়ায় এসে রাজধানী স্থাপন করেন। পান্ডুয়া থেকে অজয় নদীর তীর পর্যন্ত পান্ডুরাজার রাজ্যসীমা। এই পান্ডুরাজার বাড়ির ধ্বংসস্তূপ হল, 'পান্ডুরাজার ঢিবি'। অন্য এক কাহিনী অবলম্বনে জানা যায় যে, কোনো এক রাজা ছিলেন তার নাম হল পান্ডু। তার রাজ্যপাট ছিল পরবর্তীকালে তা ধ্বংস হয়ে ঢিবিতে পরিণত হয়। এই মতানুসারে পান্ডুস্থানীয় নরপতি ছিলেন, কোনো বহিরাগত নয়। কারণ আজ থেকে প্রায় 4000 বছর আগে যে শাক্যবংশের অস্তিত্ব ছিল তেমন প্রমাণ

কোথাও নেই।

পান্ডুরাজার ঢিবিতে ছয়টি সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছিল। যা ভারতবর্ষের প্রত্ন ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা। এই ছয়টি সভ্যতাকে ছয়টি পর্বে বিভক্ত করা হয়। যথা—

প্রথম পর্ব— খ্রিষ্টপূর্ব 1600 অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব 1400 অব্দ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় পর্ব—খ্রিষ্টপূর্ব 1200 অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব 900 অব্দ পর্যন্ত।

তৃতীয় পর্ব— খ্রিষ্টপূর্ব 899 অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব 600 অব্দ পর্যন্ত।

চতুর্থ পর্ব— খ্রিষ্টপূর্ব 500 অব্দ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব 400 অব্দ পর্যন্ত।

পঞ্চম পর্ব— খ্রিষ্টপূর্ব 300 অব্দ থেকে 300 খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

ষষ্ঠ পর্ব— 400 খ্রিষ্টাব্দ থেকে 1000 খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে 200 বছর তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের মধ্যে 100 বছর। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্বের মধ্যে 500 বছরের একটি ফাঁক আছে। এই সময়কে অনেক ঐতিহাসিকের মতে পান্ডুরাজার অন্ধকারযুগ বলা হয়। কারণ এই সময়ের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

এছাড়াও প্রথমদিকে অর্থাৎ 1962 খ্রিঃ পর্যন্ত 5 বার খননকার্য করা হয়। খননকার্যের সময় উপস্থিত ছিলেন পরেশনাথ দাসগুপ্ত, ড. দেবকুমার চক্রবর্তী, শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও ওয়ার্ডি শর্মা, ড. বি. পি. লাল এর মতো বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিকরা। 5 বার খননকার্যের সময় 53 টি খাল বা গর্ত খনন করা হয়। এবং গর্তগুলির গভীরতা প্রায় 4 মিটার থেকে 6 মিটার। এছাড়া 350 টির মতো নমুনা সংগ্রহ করা হয়। 1985 সালে খনন কার্যের ফলে 6 টি স্তরের অস্তিত্ব মেলে। এর মধ্যে একদম নীচের স্তরটি তাম্রপ্রস্তর যুগের ছয়টি স্তর থেকে একটি বোঝা যায় যে সভ্যতাটি বারবার ধ্বংস হয়েছে আবার গড়ে উঠেছে। এছাড়া 14 টি কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে। যার উচ্চতা প্রায় 6 ফুট। সেই সময় যে সমস্ত লৌহ যুগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলি হল— চুনের প্রলেপ লাগানো উনুন, টেরাকোটার পাত্র, পুঁতি ও তামা দিয়ে তৈরি অলংকার, লোহা দিয়ে তৈরি ইট, কাস্তে, মাছের চিহ্ন দেওয়া ভাঙা কেটি, সোনার মুদ্রা ইত্যাদি।

উপরোক্ত নিদর্শনগুলি রেড়িও কার্বন * পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ—

1. প্রাগৈতিহাসিক বাংলা— শ্রী পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অনিমা প্রকাশন।

2. বাঙালীর ইতিহাস — শ্রী নীহাররঞ্জন রায়। দেজ পাবলিশিং, কলকাতা।

3. বর্ধমান ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি — শ্রী শ্রী যজ্ঞেশ্বর চৌধুরি, অক্ষয় প্রকাশন।

4. Google, internet প্রভৃতি।

চিত্ত বিনোদনে কালিম্পং যাত্রা

নিকিতা জানা

রোজকার একঘেয়ে জীবন থেকে কিছুদিন বিরতি নেওয়ার জন্য আমরা মাঝেমধ্যেই ছুটে গিয়ে থাকি বিভিন্ন ভ্রমণ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। ভ্রমণ করলে আমাদের মন ও শরীর উভয়ই পরিতৃপ্তি পায়। তাই প্রাচীনকাল থেকেই ভ্রমণ হল মানুষের জীবনের সর্বোত্তম চিত্তবিনোদনের উপাদান। বাঙালি স্বভাবতই ভ্রমণ পিপাসু জাতি। আর আমিও তার ব্যতিক্রম নই। ভ্রমণের জন্য বহু জায়গায় ঘুরে বেড়ালেও আমার সবথেকে পছন্দের গন্তব্য হলো পাহাড়। ছোটবেলা থেকেই পাহাড় আমায় ভীষণভাবে আকর্ষণ করে। সেই কারণেই আমি অতি সম্প্রতি পাহাড় ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ছুটে গিয়েছিলাম। আমার পাহাড় ভ্রমণের এক মধুর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার জন্য বা উদ্দেশ্যেই এই প্রতিবেদন রচনা। বাড়ির কাছাকাছি পাহাড় বলতে বাঙালির সর্বপ্রথম যে নামটি মাথায় আসে তা নিঃসন্দেহে দার্জিলিং। কিন্তু আমার পরিবার থেকে আমাদের গন্তব্যস্থল ঠিক করা হল কালিম্পং। আমাদের যাত্রা শুরু হল শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রাত আটটার উত্তরকন্যা এক্সপ্রেসে চড়ে। রাতের ট্রেনের যাত্রা আমার বরাবরই প্রিয়। আর পরের দিন সকাল যখন হলো তখন বুঝতে পারলাম উত্তরবঙ্গ পৌঁছে গেছি, শীত বেশ জাঁকিয়ে এসেছে এই দিকটায়। গায়ে গরম জামা চাপিয়ে নিতে নিতে নিউ জলপাইগুড়ি এসে থামল আমাদের ট্রেন। সেখান থেকে কালিম্পং এর দিকে রওনা দিলাম। জলপাইগুড়ি থেকে কালিম্পং পৌঁছাতে সময় লাগলো ঘন্টা তিনেক। পাহাড়ের রানী দার্জিলিং শহর থেকে বেশ কিছুটা নিচে অবস্থিত ছোট্ট শহর কালিম্পং। পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে কেটে বেশ কয়েকটি স্তরে তৈরি হয়েছে এই শহর। পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপ বেয়ে, খাড়াই পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে উঠে একটা হোটেল ঠিক করে সেখানে ব্যাগপত্র রেখে আমি, বাবা আর দিদি শহরটাকে ইতস্ততঃ ঘুরে দেখবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। মা রইল হোটেলের ঘরে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। এই শহরটাতে ঝাঁ চকচকে দোকান নেই, ভ্রমন পিপাসু মানুষদের তেমন ভিড়ভাট্টা নেই; শুধুই পাহাড়ি লোকদের সাধারণ জীবনযাত্রা মন্থর গতিতে এগিয়ে চলছে। ভ্রমণের প্রথম দিনটা কালিম্পং-এ কাটিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করে রওনা হলাম পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। লাভা হল কালিম্পং থেকে বেশ খানিকটা উপরে পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটি গ্রাম। লাভা যাওয়ার পথে গাড়ি থেকে নেমে দেখে নিলাম কালিম্পং মিউজিয়াম, জেলার বাংলো, আর খেয়ে নিলাম মোমো। সেদিন রাতটা লাভার হোটেলে কাটিয়ে পরের দিন সকাল হতে না হতেই দেখতে গেলাম লাভার বিখ্যাত বৌদ্ধমঠ। কী অপরূপ সুন্দর সেই মঠের উপর থেকে নীচের দৃশ্য! যেদিকে তাকাই পাহাড়ি গাছ মেঘের উপরে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সমগ্র মাঠটিকে ঘিরে রেখেছে পেঁজা তুলোর মত মেঘ। যেন মেঘের সাম্রাজ্যেই সিংহাসনের মতন এই মঠের অবস্থান। সেদিন লাভার বৌদ্ধমঠ থেকে বেরিয়ে গাড়ি করে আমরা গিয়েছিলাম আর একটি ছোট্ট গ্রাম লোলেগাঁও-এ। এই গ্রামটি তুলনামূলকভাবে লাভার থেকে অনুন্নত। রাস্তাঘাট তখনো ঠিক করে তৈরি হয়নি। এমনি রাস্তা দিয়ে একটি জঙ্গলের বাইরে আমাদের গাড়ি থামল। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশ করে আমরা পৌঁছে গেলাম ঝুলন্ত সেতুর কাছে। সত্যি বলতে সেই ঝুলন্ত সেতুর থেকেও ওই জঙ্গলের মধ্যে মনোমুগ্ধতার পরিবেশ আমার অনেক বেশি ভালো লেগেছিল। চারিদিক থেকে নাম -না -জানা বিভিন্ন পাখির ডাক, গাছের ফাঁক দিয়ে আলো আঁধারি প্রকৃতির দৃশ্য আমার চিরকাল মনে থেকে যাবে।

ভ্রমণ হল বাঙালি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই ভ্রমণের গন্তব্য যদি পাহাড় আর জঙ্গল একই সাথে হয়,

তাহলে সেই ভ্রমণে এক অনন্য মাত্রা যোগ হয়। আমি ইতিপূর্বে কোনোদিন এইভাবে একসাথে পাহাড় আর জঙ্গলকে অনুভব করিনি। সে কারণে আমার কাছে এই বারের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমি ঠিক করেছি এবার থেকে মাঝে মধ্যেই ছুটিতে বাবা মায়ের সঙ্গে এমনই অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ কোন গন্তব্যের উদ্দেশ্যের পাড়ি জমাবো। হিমালয়ের আর অরণ্যের আকর্ষণে বারবার ছুটে যাব কোন না কোন নাম না জানা পাহাড়ি শহর কিংবা গ্রামের উদ্দেশ্যে।

প্রত্যন্ত গ্রামের বুকে উচ্চশিক্ষার বাহন হিসেবে সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়

বিশ্বজিৎ দাস (প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ)

বর্নমালায় গাঁথা সুখস্মৃতির সাথে মানুষের কিছু স্মৃতি থাকে অমিলন। কিছু স্মৃতি মুছে যাওয়ার নয়। ইট পাথরের ক্যাম্পাসের প্রতিটি দিনের স্মৃতি যেন মিশে আছে হৃদয়ের পথে। দূর অতীতকে জীবন্ত করে বর্তমানকে ভুলিয়ে দিতে চায় সেসব স্মৃতি। শেকড়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কিছু ভালোলাগা কিছু মন্দলাগা তুলে ধরলাম সিদ্ধিজ্যোতির বক্ষে। স্বপ্নবাজ এ তরুণের কাঙ্খিত কলেজে ভর্তির সুযোগ পাওয়ায় তার আনন্দের। কিন্তু আমার কাছে এই দিনটি ছিল বিষাদের কারণটা বলি প্রথম থেকেই ইচ্ছে ছিল বাইরে গিয়ে বড়ো কলেজে পড়ার কারণ আমার সব বন্ধুরা বাইরের কলেজে ভর্তি হয়েছিল। বাড়ির চাপেই ভর্তি হয়েছিলাম সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ে। অবশ্যই সেই দিনের সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয় এর ছাত্রীরা প্রমাণ করেছিল শুধুমাত্র ছোটো কলেজ দেখে বিচার করো না রেজাল্টের দিক দিয়ে বিচার করতে শেখো। অবশ্য যাঁর কর্মকান্ডে এইরকম প্রত্যন্ত গ্রামের বুকে সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল, যাঁর নিরলস প্রয়াসে সেই শ্রদ্ধেয় নির্মল চন্দ্র মাইতি মহাশয়কে জানাই প্রনাম। বাংলায় একটা কথা আছে ''প্রবাহমানতাই জীবন আর থেমে থাকাই মৃত্যু।'' নির্মল বাবু তাঁর জীবনের নিরলস প্রয়াস দিয়ে কত ঘাত- প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন এই মহাবিদ্যালয়। এর ফলে যথেষ্ট সাহায্য হয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবার ও মেয়ে ও তপসিলী জাতি উপজাতির ছাত্রছাত্রীদের কারণ প্রত্যন্ত গ্রামের বুকে এইরকম উচ্চশিক্ষার মাধ্যম না থাকলে তাদের সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হত। প্রায় ৪ বছর সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে সর্বক্ষেত্রে। সত্যি আজ গর্ব করে বলতে ইচ্ছে করে আমি সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। এ ছিল কলেজ সম্বন্ধে আমার অনুভূতি। কথায় বলে— 'যার শেষ ভালো তার সব ভালো'। আজও মনে পড়ে ঊষশী ম্যাম, প্রত্যুষ বাবু, সঙ্গীতা ম্যাম, নমিতা ও অনুশ্রী ম্যামের কথা এছাড়া সবার প্রিয় বিপ্লব স্যার ও তারক দার কথা যা কোনোদিনই ভোলার নয়। কালের অমোঘ নিয়মে স্রোতধ্বনি নদীর মতো নিজস্ব ধারায় চলতে চলতে তিনটে বছর কাটিয়ে ফেললাম বুঝতেই পারলাম না। এছাড়া সর্বকাজে সহযোগিতা পেয়েছি শ্যামশ্রী সুর ম্যাডাম ও শান্তিগোপাল মাইতির কাছে। আমার বিভাগীয় সহপাঠী মুনমুন, করুণা, প্রবীর আমার জীবনের সবথেকে বেশি জায়গা দখল করেছে যা সত্যিই অস্বীকার করার নয়। কলেজে যেটা সবথেকে ভালো তা হল নিয়মশৃঙ্খলা ও নিয়মিত ক্লাস। আমার মতো সাহিত্য বোধহীন ছাত্রের কাছে লেখা কাজটা অত্যন্তই কঠিন। অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক ভুল-ত্রুটি রইল। সবাই ভালো থাকবেন। সুস্থ থাকবেন।

স্মৃতির ডায়রির পাতায়

রাধারাণী আদক, (প্রাক্তন ছাত্রী, এডুকেশন বিভাগ)

রবিঠাকুরের ভাষায়— তব পদতাঙ্কনগুলিরে
কতবার দিয়ে গেছে মোর ভাগ্যপথের ধূলিরে
আজু যবে
দূরে যেতে হবে
তোমারে করিয়া যাব দান
তব জয় গান।

গাইতে চাই জয়গান, মহাবিদ্যালয় এবং যাদের অনুপ্রেরণায় শ্যামসুন্দরপুর পাটনা গ্রামের মধ্যে গড়ে উঠেছে সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয়। আমি বলি বিবেকানন্দ- নিবেদিতার চর্চা হোক, A. P. J Abdul Kalam রবানীর চর্চা হোক, আর তার সাথেই চর্চা হোক সিদ্ধিনাথ মহাবিদ্যালয় তথা বিদ্যামন্দির এবং প্রধান শিক্ষক নির্মল চন্দ্র মাইতি মহাশয়ের আত্মত্যাগ। যিনি খালিপদবাবু নামে পরিচিত। পরনে খাদির পোষাক কিন্তু ব্যক্তিত্বে James Bond. আমার কাছে এই ব্যক্তিত্ব বীর পুরুষের আখ্যা প্রাপ্ত করে। তাই শেলি বলেছেন—

'বেদনার সন্তান না হলে তোমার আনন্দের কাছে আসতে পারতাম না।'

যাই হোক, লেখা প্রসঙ্গে বলি, মহাবিদ্যালয়ের তৈরির ক্ষেত্রে সকল মানুষের দল, প্রচেষ্টা সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছে মহাবিদ্যালয়কে।

এবার আসি তাঁদের কথায় যেনারা স্নেহ মমতা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য মন্ডিত করে তুলেছেন। মহাবিদ্যালয়ে সর্বদা বিদ্যালয়ের ন্যায় নিয়ম শৃঙ্খলা এবং তাঁদের শিক্ষনীয় প্রণালী, ছাত্রছাত্রী সহিত Friend, Philosopher, Guide এর ন্যায় পাশে থেকেছেন। প্রথমেই শিক্ষাবিভাগের কৃষ্ণাম্যাম, মৌমিতা ম্যাম, নয়নতারা ম্যাম এর নিকট যখনই সাহায্য চেয়েছি তখনই তা সমাধান করেছেন এবং সর্বদা পাশে থেকেছেন। প্রথম থেকে না হলেও কিছুদিন পরে শ্যামশ্রী সুর ম্যাম এলেন, ম্যামের হাসিটা খুব মনে পড়ে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বিশেষ করে খুব মনে পড়ে বিভাগীয় অন্যান্য শিক্ষক- শিক্ষিকা প্রিয় ঊষসী ম্যাম, ম্যামের সমস্ত জ্ঞানের ভান্ডার পরিপূর্ণ। প্রতিটি সমস্যায় ম্যাম আমায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। ম্যাম বলতেন, 'বিশ্বাসে মেলে বস্তু তর্কে বহুদূর।' ম্যাম এনার দ্ব্যর্থক কেই বেছে নিয়েছিলেন, এর পরেই আরও একজন প্রিয় স্যার, কৃষ্ণ স্যার, যিনি ছাত্রছাত্রীদের কোনো বিষয় বোঝাতে না পারলে অস্বস্তি বোধ করতেন, মিষ্ট ব্যবহার, প্রতিটি সমস্যাকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করতেন। যিনি বারবার বোঝাতে গিয়েও ক্লান্ত হতেন না.। মনে পড়ে শিক্ষায় প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহার করে Projection র মাধ্যমে পড়িয়েছিলেন কৃষ্ণবাবু দ্বিতীয় তলার হল ঘরে। মহাবিদ্যালয়ে সদ্য তৈরি হওয়া Smart room টা আমায় ডাকে। ঊষসী ম্যাম এবং কৃষ্ণস্যার প্রিয় বলে ভুল হবে আমি ওনাদের প্রতি মুগ্ধ। ঊষসীম্যাম শুদ্ধ বাংলা বলতেন যা মুগ্ধতা এনে দেয়। কৃষ্ণ স্যার ছাত্রছাত্রীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এড়িয়ে চলতেন। এছাড়া জীবন অভিজ্ঞতার পর্বতের ন্যায় যেনারা সান্নিধ্যদান করেছেন তাঁরা হলেন অমিত স্যার, সঙ্গীতাম্যাম, নমিতাম্যাম, প্রত্যুষস্যার, অনুশ্রীম্যাম, শুভজিৎবাবু, দেব্রতবাবু, অন্যবিভাগীয় হলেও স্যারেরা সকল কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন, যা আমার সাফল্য আনতে সহায়তা করে। যার যথোপযুক্ততা দেখেছি সকল স্যার ও ম্যামের নীরব

আত্মত্যাগ এ। এছাড়া মনে পড়ে সবুজ ঘেরা গ্রামের সমস্ত প্রিয় মানুষ, সহপাঠী ও দাদাদিদিরা; যাদের কখনো বললে খাওয়া- দাওয়ার শেষে চাটনির অভাব থেকে যায়, আসলে মহাবিদ্যালয়ে এসে নতুন করে আলাপ করার প্রসঙ্গ আসেনি ঠিকই সব চেনা অচেনার অল্প পরিসরে বন্ধুত্বটা আরও গাঢ় হয়েছিল, সেগুলিকে মনপুকুরে নিয়েই চলেছে সাফল্যের আশাতে।

পরিশেষে জীবনের অনেকটা মুহূর্ত কাটিয়েছি আরও একজন মানুষের সাথে তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় বিপ্লব বাবু। যিনি লেখার সুযোগ না দিলে এতটা কালি লেখনি হয়ে উঠত না। যিনি Library তে দিনের পর দিন যখনই সাহায্য চেয়েছি English sentence গুলিকে যথাসম্ভব সরল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন নির্দ্বিধায়। এখনও পর্যন্ত ওনার স্নেহশীল আচরণ আমায় কৃতজ্ঞ করে। এছাড়া তারকদা, শান্তিদা, সুজিতবাবু, তপনদা দের সহযোগিতা আমায় সমৃদ্ধ করে। যাইহোক, এ সকল টুকরো টুকরো আনন্দ সবই এখন গড্ডলিকা প্রবাহের ইতিহাসের খাতায়। আজও বাড়ির পথে আসার সময় মহাবিদ্যালয়ের দিকে তাকালে মনে করিয়ে দেয় আমরা প্রাক্তন।

আবার রবি ঠাকুরের ভাষায় আসি—

"তোমার ঐশ্বর্য মাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে
করিয়ো সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান।"

"তুমি আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দেবো"।

— নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

একটি ব্যতিক্রমী শহর চন্দননগর

সৌমেন দোলই

মনসামঙ্গল ও কথ্য চন্ডির লেখায় এই শহরের উল্লেখ আছে। শহরটির নামকরন হয়েছিল এখানকার চন্দন গাছ থেকে। বিদেশিদের আগমনের বহু পূর্বে অন্যতম বানিজ্যিক কেন্দ্র ছিল এই শহর। লাক্ষা, মুগ, সোরা, বেত, চন্দনকাঠ, রেশম ও মশলা রপ্তানির সমৃদ্ধি লাভ করেছিল এই শহরটি। তাঁত শিল্পেও এই শহরটি ছিল বিখ্যাত। হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত খালসানি, বড়ো ও গোন্দল পাড়া নামক তিনটি প্রাচীন মৌজার এবং গৌয়হাটি এবং গোড়হাটির ছিটমহল সহ নয় বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে শহরটি গঠিত। বিভিন্ন বর্ণের হিন্দু, মুসলমান, ইউরোপীয় ও আর্মেনিয়গন এখানে বসবাস করত, শহরটির নাম চন্দননগর।

1673 খ্রিঃ ফরাসি নাগরিক ডুপ্লে এখানে প্রথম পদার্পণ করেন। 1888 খ্রিঃ একটির ফরমানের বলে ফরাসীরা এখানে একটি কুটির নির্মাণ করেছিল। পরবর্তীকালে ফরাসী গভর্নর জোসেফ দ্রান্সিপ ডুপ্লে স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে জমি নিয়ে উত্তরের তালডাঙা থেকে দক্ষিণে গৌরহাটি পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন। একজন গভর্নর ডারেক্টর শহরটিকে প্রসারিত করেছিল ও পাঁচ সদস্য গঠিত কাউন্সিলের মাধ্যমে ফরাসিদের দ্বারা পরিচালিত এই শহর সাধারণ বাঙালির কাছে ফরাসি ডাঙা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

ফরাসিদের অধীনে এই শহর অতিদ্রুত আধুনিক রূপ পেতে শুরু করে। ভারতে সংগঠিত ইঙ্গ ফরাসি যুদ্ধ হোক অথবা 1757 সালের পলাশীর যুদ্ধ হোক এই শহর ইতিহাসের পাতায় নিজের ভূমিকা জাহির করে এসেছে। পলাশী যুদ্ধ পর্বে মিরজাফর যুদ্ধক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করবে কিনা তা নিশ্চিত করতে রবার্ট ক্লাইভ এই শহরে এসেছিলেন।

ইউরোপে সংঘটিত ফরাসী বিপ্লবের চেতনা এই শহরকে প্রভাবান্বিত করেছিল। ব্রিটিশাধীন না হওয়ায় ব্রিটিশ আন্দোলনের সাথে যুক্ত বহু বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী যেমন— কানাইলাল দত্ত, মতিলাল রায় প্রমুখের রাজনৈতিক আশ্রয়স্থল ছিল এই শহর। 1947 সালে ভারত স্বাধীন হলেও এই শহর তখনও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ছিল। অবশেষে 1949 খ্রিঃ গনভোটের মাধ্যমে কলকাতা থেকে 35 km দূরে অবস্থিত বর্তমান হুগলি জেলার মহকুমা শহর চন্দননগর ভারতীয় ইডনিয়নের একটি অংশে পরিনত হয়। দীর্ঘ ফরাসী উপনিবেশিক কেন্দ্র হিসেবে এখনও এখানে বেশ কিছু স্থাপত্য নিদর্শন অবস্থান করেছে। এমনকি এখনও ফরাসি সরকার চন্দননগরের উন্নতিকল্পে চন্দননগর পৌরসভাকে অর্থপ্রদান করে।

ইতিহাসের কারাগার জিনজিরা প্রাসাদ

অমিত মান্না (তৃতীয় বর্ষ)

1757 খ্রিঃ পলাশী যুদ্ধে মিরজাফর- এর বিশ্বাসঘাতকতার কথা আমরা জানি। মিরজাফরের এই বিশ্বাসঘাতকতার ফসল লাভ করেছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। সিরাজ উদ্ দৌলার বিরুদ্ধে এই বিশ্বাসঘাতকতার অন্যতম নিয়ন্ত্রক ছিলেন সিরাজেরই মাসি ঘসেটি বেগম। একদা সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী মিরজাফরের সহযোগিনী ঘসেটি বেগম একটা সময়ের পর নিজেই মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পর সিরাজের পরিণতি আমরা প্রত্যেকেই জানি কিন্তু সিরাজের স্ত্রী, শিশুকন্যা, সিরাজের মা এবং মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় আক্রান্ত সিরাজের মাসি ঘসেটি বেগমের পরিণতি কী হয়েছিল তা অনেকের কাছেই অজানা। এই পরিণতিরই আর এক গল্প জিনজিরা প্রাসাদ।

জিননিরা প্রাসাদ একটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি যা বাংলাদেশের ঢাকা শহরে বুড়িগঙ্গার ওপর কয়েকশ গজ দূরে অবস্থিত। জিনজিরা জাজিরার অপভ্রংশ, যার অর্থ হল আইল্যান্ড বা দ্বীপ। পলাশী যুদ্ধের সর্বশান্ত সিরাজের পরিবার পরিজনকে 1620- 1621 খ্রিঃ নির্মিত জিনজিরার প্রাসাদ নওঘরাতে প্রেরণ করা হয়েছিল। সিরাজের পতনের পূর্বে ষড়যন্ত্রকারীরা ঘসেটি বেগমকে ব্যবহার করলেও যুদ্ধে সিরাজের পতন হলে সিরাজের মা আমেনা, স্ত্রী লুৎফুন্নেজা ও শিশুকন্যা সহ মাসি ঘসেটি বেগমকেও জরাজীর্ন জিনজিরা প্রাসাদে প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা বেশ কিছুদিন বন্দী জীবন যাপন করার পর মিরজাফরের পুত্র মিরনের চক্রান্তে 1750 খ্রিঃ দৃশ্যের কোনো এক সন্ধ্যায় যখন ঘসেটি বেগম ও আমেনা বেগম নৌকায় করে বুড়িগঙ্গায় যখন ঘসেটি বেগমকে নিয়ে জিনজিরা প্রাসাদ থেকে মুর্শিদাবাদ যাচ্ছিল, তখন নৌকাটি ডুবিয়ে দিয়ে তাদের হত্যা করা হয়। ক্লাইভের হস্তক্ষেপ সিরাজের স্ত্রী ও শিশু কন্যা প্রাণ রক্ষা পায় এবং তাদের জিনজিরা থেকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয়। এবং 1750 খ্রিঃ সিরাজের স্ত্রীর মৃত্যু হয়।

'আমরা যা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখি তা স্বপ্ন নয়, যা আমাদের ঘুমাতে দেয় না তাই হল স্বপ্ন।'

— এ.পি.জে আব্দুলকালাম

কর্মই ধর্ম

পলাশ ভুঞ্যা (অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ)

মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সাধারণভাবে অনুবর্তমান বিষয় হল কর্ম। তাই ভারতীয় দর্শন চিন্তায় কর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কর্মের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

''ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃত।
কর্মতেহ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতি জৈর্গুচণঃ।।'

(শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৩/৫)

শ্লোকটির অর্থ হল — ''কেহই কখনও ক্ষণকালও কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। কেননা প্রকৃতির গুণে অবশ হইয়া সকলেই কর্ম করিতে বাধ্য হয়।'' অর্থাৎ আমাদের জীবন প্রবাহে কর্ম হল অবশ্যম্ভাবী। কর্মপ্রবৃত্তির বিশ্লেষণে ভারতীয় দর্শনে নৈতিক কর্মবাদ স্বীকৃত হয়েছে। যা কর্ম-কারণ সম্বন্ধের অনুরূপ। নৈতিক কর্মবাদের মূল বক্তব্য হল — জীবনে প্রাপ্ত সুখ-দুঃখ হল কর্মের জন্য, কর্মের ফল। এই কর্মবাদ কার্যনীতির (Law of Karma) উপর প্রতিষ্ঠিত। যার মূল বক্তব্য হল — প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। এবং ভাল কর্ম ভাল ফল প্রসব করবে, মন্দ কর্ম মন্দ ফল প্রসব করবে।

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমাদের একটি বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটি হল — সমস্ত মানব সমাজ বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে। যা মানুষের অন্তর জগতে এমন একটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যেটি মানুষের মূল্যবোধকে ধ্বংস করে সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করছে। বর্তমান সময়ে সামাজিক অবক্ষয় সমাজে মারণ-ব্যাধির আকার ধারণ করেছে। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থা ও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা সমস্যাটিকে প্রকাশ করতে পারে। প্রাচীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশের সঙ্গে বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে বিবিধ বিষয়ে পার্থক্য থাকা প্রকৃতিগত ভাবে স্বাভাবিক। যা বিবর্তনের ধারার সঙ্গে সমানুপাতিক হারে হওয়াই বাঞ্চনীয়। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই পরিবর্তন ধারার মধ্যেও অপরিবর্তিত থাকাটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা বিবর্তনের ক্ষেত্রটিকে আমরা বুঝে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারি। বৈদিক ও উপনিষদীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী গভীর অরণ্যে গুরুর নিকটে উপবেশন করে অত্যন্ত শ্রদ্ধাবনতভাবে এই শিক্ষা অর্জন করত। সেই শিক্ষা তারা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে গ্রহণ করত। যদিও সেই শিক্ষা সবাই অর্জন করার সুযোগ পেত না।

পরবর্তীকালে গুরুকুল ব্যবস্থা, তার পরবর্তী কালের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় ভাব বজায় ছিল। অবশ্য এই ধর্মীয়ভাব কোন বিশেষ ধর্ম (হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ইত্যাদি) সম্প্রদায়ে বিশ্বাস নয়। এটি হল শিক্ষার্থীর ধর্ম, যেমন — শ্রদ্ধা, মনোযোগ, সৃষ্টিশীলতা, অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি। অপরদিকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক সারল্য এসেছে। বিজ্ঞানমনস্কতার বৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিক্ষার্থীর ধর্মের অবক্ষয় হয়েছে নিঃশব্দে।

শুধুমাত্র শিক্ষাব্যবস্থায় নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই (কৃষি, ব্যবস্থা, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি) আমরা ব্যাপক অবক্ষয় লক্ষ্য করতে পারি। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই অবক্ষয় রোধ করে সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে

রাখাটাই মানুষের কাছে একটি অন্যতম কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মূল্যবোধ, নৈতিকতা, ধর্মীয় মনোভাব হারিয়ে আমরা কিন্তু কর্ম থেকে বিরত হইনি। ফলে সমাজ আজ দিশেহারা হয়ে ক্রমশ তমসাচ্ছন্ন হয়ে চলেছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তির একটি মাত্র উপায় হল — আমাদের কর্মকে ধর্মে রূপান্তর করা। তবেই বর্তমান সামাজিক অবস্থার ভয়াবহতা থেকে আমরা মুক্তির আলো দেখতে পাবো। 'কর্ম' কে 'ধর্ম' তে রূপান্তর করার জন্য সবার প্রথম ধর্মের অর্থ আমাদের স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।

'ধর্ম' - এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল — 'Religion' এই 'Religion' কিন্তু 'Religious' নয়। এই 'Religion' হল 'Experience'। এই দৃষ্টিকোন থেকেই আমরা 'ধর্ম' শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করব। প্রসঙ্গত; ধর্মের অর্থ সম্পর্কে মহাভারতের বনপর্বে বলা হয়েছে–

''ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।''

অর্থাৎ বিষয়টি হল — মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই হল ধর্ম। যে সমস্ত মনীষী সমাজের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় জগতে আবির্ভাব হয়েছেন তাদের আদর্শ, অধ্যাবসায়, জীবনশৈলী' অনুশীলন করাই হল 'ধর্ম' শব্দের বহুল প্রচলিত অর্থ। অন্য অর্থ হল — ''ধর্ম বলতে কোন বস্তুর স্বরূপ বা স্বভাব বোঝায়''। ইংরেজিতে একে বলা হয় — ''Essential Property''. অর্থাৎ ধর্ম অপরিহার্য গুণ। যেমন — আগুনের দহন শক্তি, চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি, মানুষের ধর্ম হল মনুষ্যত্ব। এটিই হল মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। মনুষ্যত্ব ধর্ম প্রকাশের দ্বারাই মানুষ সর্বাঙ্গ সুন্দর একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবে। উপরোক্ত দুটি অর্থই 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মণ' প্রত্যয় করে ধর্মের যে মূলসার অর্থাৎ যা এই বিশ্বজগৎকে ধারণ করে আছে - কে প্রতিষ্ঠা করেছে।

'ধর্ম' শব্দের অপর একটি অর্থ আছে যা উপরোক্ত দুটি অর্থ থেকে যৌক্তিকভাবে নিঃসৃত হয়। অর্থটি বিশ্বব্যাপী নিয়মশৃঙ্খলা, নৈতিক আচরণ ও কর্তব্যকে প্রকাশ করে, যাকে ঋগ্বেদ 'ঋত' বলা হয়েছে। 'ঋত' -র পথই হল সত্য, ন্যায় ও মঙ্গলের পথ। পরবর্তীকালে এই 'ঋত'-ই ধর্মে পরিণত হয়েছিল। তৈত্তরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে —

'ধর্মোবিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা'

'ধর্মে সর্বম প্রতিষ্ঠিতম্'।।

শতপথ ব্রাহ্মণে, ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে —

''সত্যই ধর্ম, ধর্মই সত্য''।

ধর্মের এইরূপ প্রকাশ মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য কর্ম ও আচরণরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তাই মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীমের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে — ''সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম''। এই সত্য গুলি হল — ক্ষমা, অমাৎসর্য, সমতা, তিতিক্ষা, অনুসূয়া, ত্যাগ, দান, ধৃতি, দয়া, অহিংসা, দম এবং আর্যত্ব। এই সত্যগুলি আমরা আমাদের কর্মের মধ্যে অভ্যাস করলে মানব জীবনে আবার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে। 'মনুসংহিতা' - তে ধর্মের যে ১০টি লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তা মানুষের অবশ্য পালনীয় কর্ম রূপে পরিগণিত হয়।

''ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ ধী বিদ্য সত্যোমক্রোধো দশকং ধর্ম লক্ষণম।''

(মনুসংহিতা — ৬/৯২)

উপরোক্ত দশটি আচরণ আমরা প্রত্যেকেই জীবনে অনুশীলনের দ্বারা কর্মের মধ্যে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে ধার্মিক জীবন লাভ করতে পারি।। 'মনুসংহিতাতে' ধর্মের অমর একটি লক্ষণে বলা হয়েছে —

''বিদ্বদ্যিঃ সেবিতঃ সদ্যিনিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যে ধর্মঃ তৎ নিবোধত''।।

(মনুসংহিতা — ২/১)

অর্থাৎ যারা রাগদ্বেষের বশীভূত নয়, এমন বিদ্বান ও সাধু ব্যক্তিদের হৃদয়ের অনুজ্ঞা যে কার্য অনুমোদন করে তাই ধর্ম। এক্ষেত্রেও ধর্মকে মানব জীবনের নৈতিকতা অনুশীলনের বিষয়রূপে প্রকাশ করা হয়েছে। আবার 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'তে বলা হয়েছে — ''অহিংসা, সত্য, অস্তেয় শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দান, দম, দয়া, শান্তি''। এই কয়টি হল ধর্মের সাধন। এই ক্ষেত্রে ধর্ম যে অনুশীলনের ব্যাপার তা প্রকাশ পেয়েছে।

'ধর্ম' শব্দের অর্থ নির্ধারণ করার পর, যে বিষয়টি আলোচনা করা দরকার। সেটি হল — কর্ম কীভাবে ধর্মে পরিণত হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বহু বিস্তৃত আলোচনা করতে পারি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা প্রধানত শ্রীমদ্ভগবদগীতা, বৌদ্ধ নীতিবিদ্যা ও জৈন নীতিবিদ্যা সংক্ষেপে আলোচনা করব। আমরা সকলেই অবগত যে, ভাব বা ভাবনা আমাদেরকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। প্রথমে আমাদেরকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। তাই প্রথমে আমাদের জানতে হবে — কোন্ ভাব নিয়ে আমরা কর্ম করব। কর্মভাবনা প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদগীতার ২-য় অধ্যায়ের দুটি শ্লোকে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। যথা —

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু বন্দানে।
যা কর্মফল হেতুর্ভূর্মাতে সঙ্গোহস্ত্বকর্মনি।।' (২/৮৯)

অর্থাৎ, ''হে অর্জুণে কর্মতেই তোমার অধিকার। কর্মের ফলে যেন অধিকার না হয়। ফললাভের আকাঙ্খা যেন তোমার কর্মের প্রবর্তক না হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম না করিবার প্রবৃত্তিও যেন তোমার না জাগে।''

অপরটি হল —

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়
সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সামত্বং যোগ উচ্যতে।।

(২/৪৮)

অর্থাৎ, হে অর্জুন ঈশ্বরের যুক্ত হইয়া, ফলাসক্তি পরিত্যাগ - পূর্বক সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য জ্ঞান করিয়া সমস্ত কর্ম সম্পাদনা কর। সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমভাবকেই 'যোগ' বলা হয়।'' কর্মকে ধর্মে রূপান্তর করার জন্য যে ভাব বা ভাবটি প্রথমেই দরকার হয় তা হল 'যোগস্থ' হয়ে কর্ম করা। আবার শ্রীমদ্ভগবদগীতার ৩-য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে। —

''যজ্ঞার্থং কর্মনোহন্যাত্র লোকোহয়ং কর্মবনূণঃ।
তাংর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গ সমারে।।''

(৩/৯)

অর্থাৎ যজ্ঞার্থে যে কর্ম তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম মনুষ্যের বন্ধনের কারণ, হে কৌন্তেয়, তুমি সেই উদ্দেশ্যে (যজ্ঞার্থ) অনাসক্ত হইয়া কর্ম কর।''

উক্ত শ্লোকে ভগবানের নির্দেশ যে যজ্ঞার্থ কর্ম তা হল — যোগস্থভাবের সঙ্গে কর্ম করার উপায়। এই প্রকার কর্মের উপায়ই ধর্ম বলে অভিহিত হয়।

অতঃপর বৌদ্ধ নীতিবিদ্যা ও জৈন্য নীতিবিদ্যার আলোচনায় যে মূল সারটি আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় — ধর্ম হল নৈতিকতা ও সৎ আচরণ অভ্যাসের আবশ্যক ফল। এখানে স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, ধর্ম

মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত আবশ্যিক বিষয়। এই অভ্যাসের মাধ্যমে আমরা সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বৌদ্ধ নীতিবিদ্যায় যে পঞ্চশীলের (প্রাণীহত্যা করবে না, মাদক দ্রব্য গ্রহণ করবে না, কামবাসনা দমন করবে) কথা বলা হয়েছে। তা আমাদের মনের মধ্যে 'শুচিতা' নিয়ে আসে। ফলস্বরূপ তা আমাদের মনের ব্রহ্মবিহার ভাবনার (মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা) পথে আচরণকে চালিত করে। কর্মকে ধর্মে পরিণত করতে পারে। আবার জৈন নীতিবিদ্যায় মানুষের কর্মকে নৈতিকতার পথে চালিত করার জন্য 'ত্রিরত্নতত্ত্ব (সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্র), পঞ্চমহাব্রত (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ) ও পঞ্চ সমিতির (ঈর্যা সমিতি, ভাষা সমিতি, উচ্চার সমিতি) কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত প্রকার পথ অনুসরণ করে কর্মানুষ্ঠান করা মানুষের কর্তব্য - কর্ম। তার ফলে মানুষ প্রকৃতপক্ষে সমাজ, পরিবেশের সম্যক কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম হবে। শ্রীমদ্ভগবদগীতা উল্লিখিত যজ্ঞার্থ 'কর্ম' করতে সমর্থ হয়ে কর্মকে 'ধর্মে' - তে রূপান্তর করে সর্বাধিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে।

আমার সব চেয়ে বড় কাজ হল আমি মানুষের জন্য নিজেকে কতটা কাজে লাগাতে পেরেছি।

— আলবার্ট আইনস্টাইন

ভারতীয় চিন্তাধারায় জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ

আনন্দ পাহাড়ী, (অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ)

জীববৈচিত্র্য হল - উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবসহ পৃথিবীর গোটা জীবসম্ভার, তাদের অন্তর্গত জিন্ ও সেগুলির সমন্বয়ে গঠিত বাস্তুতন্ত্র। বিজ্ঞানীদের নানা হিসাবে প্রজাতি সংখ্যা (জীবন্ত) ৩০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি, তন্মধ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ শ্রেণীবিন্যস্ত হয়েছে এবং তাতে আছে প্রায় ২,৫০,০০০ শৈবাল ও অণুজীব। এখনও অনেক প্রজাতি অনাবিষ্কৃত রয়েছে। এ বৈচিত্র্যের অধিকাংশই রয়েছে পৃথিবীর গ্রীষ্মমন্ডলে, আর্দ্র-উষ্ণ এলাকায়, বিশেষত বনাঞ্চলে। জীব বৈচিত্র্য হল প্রকৃতির মূল্যবান উপহার। যেহেতু একটি বাস্তুতন্ত্রের সমস্ত জীব একে অপরের সাথে সংযুক্ত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল তাই মানুষ সহ সমস্ত জীবের জীবনে জীব বৈচিত্রের মূল্য অপরিসীম। জীববৈচিত্র্য প্রজাতি বিলুপ্তি ঠেকাতে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত ও জাতিসংঘের ও পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের এক চুক্তিতে দেড় শতাধিক দেশের প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করেন। জীববৈচিত্র্য মানুষের কাছে মূল্যবান। আমাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত সুস্থতা এর উপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুরক্ষার মতো তাই জৈব-বৈচিত্র্য রক্ষার প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করতে হবে। জীববৈচিত্র্যের পরিবেশগত মূল্য প্রতিটি বাস্তুতন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা পায়। যার ফলে মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণীর বাসযোগ্য ভূমিতে পরিণত হয় এই পৃথিবী। উদাহরণস্বরূপ, গাছ সালোকসংশ্লেষের সময় উপজাত হিসাবে অক্সিজেন মুক্তি দিয়ে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বৃষ্টিপাত ও মাটি ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ করে। জীববৈচিত্র্যের সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে নান্দনিক, বিনোদনমূলক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। বিশ্বের অনেক অঞ্চলে আদিবাসীদের জীবন এখনও বন ও পরিবেশের চারপাশে রয়েছে এবং তাদের চারপাশ থেকে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে। মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের জন্য পুরোপুরি পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।

শিল্প, গবেষণার বিকাশে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রজাতি এবং জিনের বিধান, উদাহরণস্বরূপ — কৃষি, বনজ, উদ্যানতত্ত্ব, উৎপাদন এর ক্ষেত্রে জৈব-বৈচিত্র্য এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কাঠ ও জীবাশ্ম জ্বালানিসহ বিশ্বের প্রধান জ্বালানী উৎসগুলি জীববৈচিত্রের কারণে উদ্ভব হয়েছে। উপজাতিরা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য পুরোপুরি বনের উপর নির্ভরশীল। আমাদের গ্রহের সৌন্দর্য জীববৈচিত্র্যের কারণে অতুলনীয়, যা মহাবিশ্বের অন্যান্য বন্ধ্যা গ্রহের মতো নয়। জৈবিক বৈচিত্র্য জীবনের মানকে যুক্ত করে এবং আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে সুন্দর দিক সরবরাহ করে। জীববৈচিত্র্য একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যসৌন্দর্যের অপরূপ প্রকাশ। এটি 'বেঁচে থাকুক এবং অন্যরা ও বাঁচুক' এই নীতির ভিত্তিতে তৈরি। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত নৈতিক মানগুলি সকল প্রকারের জীবন রক্ষার গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে। জীবনের সমস্ত রূপের পৃথিবীতে অস্তিত্ব থাকার অধিকার রয়েছে। মানুষ পৃথিবীর বৃহত্তম প্রজাতির একটি ছোট্ট অংশ। যখন কম জনসংখ্যা ছিল এবং কম প্রয়োজন ছিল তাদের জীব বৈচিত্র্যকে জীবন সমর্থনকারী সম্পদ হিসাবে সংরক্ষণ করেছিল, আধুনিক মানুষ বেশ কয়েকটি প্রজাতির বিলুপ্তির কারণে অপরিবর্তনীয় ক্ষতির দিকেও দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

কিছু লোক পশুর শিকারে আনন্দ পায়। মানুষ কখনও কখনও তাদের অনৈতিক কার্যকলাপ দ্বারা পরিবেশকে ধ্বংস করে এবং কলুষিত করে। মানুষের অতিরিক্ত লোভের বাসনা মানুষকে আজ অধঃপাতে নিয়ে গেছে। যার ফলে পরিবেশের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ হচ্ছে। যা জৈব-বৈচিত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। পৃথিবীর ফুসফুস আমাজন জঙ্গলে যে ভয়াবহ দাবানল সৃষ্টি হয়েছিল তার মূলে ছিল মানুষের নির্বিচারে বনভূমি ধ্বংস করা। এই বৃক্ষ ছেদনের ফলে শুকিয়ে যাওয়া গাছগুলিকে আগুনে পোড়ানো হয়েছিল, সেই আগুন থেকেই বনভূমিতে আগুন

লেগেছিল যার ফলে অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী মারা যায়। ভারতে কৃষ্ণ গন্ডার, নীলগাই, কৃষ্ণসার হরিণ, কস্তুরী মৃগ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

মানুষের এই অতিরিক্ত লোভ, আগ্রাসী মানসিকতার মূল কারণ সে নিজেকে প্রকৃতির প্রভু মনে করে। পাশ্চাত্য ভাবধারা অনুযায়ী যেহেতু মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ তথা জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করতে সমর্থ, তাই তার প্রয়োজনে প্রকৃতির যাবতীয় পরিমাণ ক্ষতিসাধন সে করতে পারে। এই দম্ভ বা অহং অহমিকা মানসিকতার জন্য সে প্রকৃতির সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুভব করে না।

সে মনে করে তার নিজের জীবন কতটা উন্নত হবে। অর্থাৎ সে প্রত্যেকটি বিষয়ে তার সাময়িক কিছু লাভ দেখতে চায় যাতে সে হঠাৎ কিছু যেন পেয়ে যায়। এইভাবে চলতে গিয়ে সে আত্মহননের পথে ধীরে ধীরে পা বাড়ায়।

কিন্তু বর্তমানে যে বুঝতে পারছে অন্যের কল্যাণ কামনাই নিজের কল্যাণের রাস্তা। জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাওয়ার ফলে নানা দুর্ভোগ নেমে আসছে। এ বিষয়ে পরিবেশগত সচেতনতা বাড়ছে। কিন্তু তাও কাঙ্খিত লক্ষ্যে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। তাই আমার মনে হয় পরিবেশগত সচেতনতার সাথে সংযুক্ত করতে হবে মানুষের নৈতিক সামঞ্জস্য। মানুষের ভাবনা ও কর্ম করার মধ্যে সঙ্গতি। আমরা মনে করি, আমরা শ্রেষ্ঠজীব তাই আমাদের প্রয়োজনে যা লাগে তা সংরক্ষণ করব নাহলে নির্বিকার থাকব। আসলে মানুষের প্রয়োজনে অন্য জীবনের মূল্য অর্থাৎ পরতঃ মূল্য, স্বতঃ মূল্য নয়। অর্থাৎ অন্যান্য জীব তাদের নিজমূল্যে মূল্যবান নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে মানুষ স্বেচ্ছাচারী, স্বার্থপর মনোবৃত্তির মধ্যে অবস্থান করবে। আর তার পক্ষে জগতের মঙ্গল করা অসাধ্য।

এখন প্রশ্ন হল যে গাছপালা এবং প্রাণীদের আমাদের গ্রহে বসবাস করার ও অস্তিত্বের সমান অধিকার নেই মানুষের জীবনের মতো? নৈতিকতা আমাদের সকল প্রকারের জীবন রক্ষা করতে এবং অকারণে কোনও জীবের ক্ষতি না করতে শেখায়। আমরা জানি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আজকের মানুষ নামের একটি প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। বর্তমানে সে বুদ্ধিবৃত্তি রূপে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, কিন্তু তার এই অস্তিত্ব টিকে থাকার জন্য অন্যান্য প্রাকৃতিক, উদ্ভিদ, প্রাণীদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই সে অন্যান্য প্রাকৃতিক তথা জৈব সম্পদের কাছে সম্পূর্ণভাবে ঋণগ্রস্থ। তাই কারোর কাছে ঋণী হলে তার ঋণ পূরণের চেষ্টা করতে হয়, যদি তা না করা হয় তাহলে তাকে বলা হয় অকৃতজ্ঞ।

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাভাবনায় পরিবেশ রক্ষা তথা জৈব সংরক্ষণের কথা আলোচিত হয়েছে। সুপ্রাচীন ভারতে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে পরিবেশ নীতি বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ভারতীয় আদর্শ মূল্যবোধ কেবল মানব প্রজাতির কল্যাণ কামনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সকল উদ্ভিদ, সকল প্রাণী, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি সকল কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল, যা এইভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ- ''সর্বে ভবন্তু সুখিনো সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ।'' পৃথিবীকে মা, মানুষ নিজেকে পুত্র বিবেচনা করেছে : 'মাতা ভূমিঃ পুত্রোহম্ পৃথিব্যাঃ।' প্রকৃতির সাথে একাত্মবোধ না থাকলে যে তাঁর ব্যাথা বোঝা যায় না তা ভারতীয় দর্শনের অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি। অথর্ববেদে প্রত্যেক প্রাণীকেই স্বঃত মূল্য ধরা হয়েছে।

ঋকবেদে উদ্ভিদকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার কথা বলা হয়েছে। অথর্ববেদে বৃক্ষরোপণের কথা বলা হয়েছে। মুনি-ঋষি গন বহু পূর্বেই সর্বভূতে আত্মদর্শন করে উদ্ভিদ লতাগুল্মকে শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে পূজা করে নৈতিক কর্তব্য পালন করতে বলেছেন। এই বিশ্বে প্রত্যেক প্রান-ই মূল্যবান।

বিষ্ণুপুরাণে বলা হয়েছে ঃ- 'ন তাড়য়তি নো হন্তি প্রাণিনোহন্যাংশ্চ দেহিনঃ। যো মনুষ্যো মানুষ্যেন্দ্র! তোষ্যতে তেন কেশবঃ।' এ পুরাণে নরকের প্রসঙ্গ তুলে বনধ্বংস বা বনচ্ছেদনকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন কে পাপ কর্মরূপে বিবেচনা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, যে ব্যথা বা কষ্ট আমি অন্য ভোগ করাচ্ছি এই জীবনে বা পরবর্তী কোন জীবনে তা আমার কাছেই ফিরে আসবে। ঋকবেদে অশ্বত্থ, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের পুজোর কথা আছে। একজন মানুষ যেমন যন্ত্রণায় কাতর হয়, একটি পিঁপড়েকে ধরলেও সে ছটফট ছটফট করে, সে বাঁচতে চায় বাড়তে চায়। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য দার্শনিক Peter Singer তার 'Practical Ethics' গ্রন্থে বলেছেন, – ——— "Animals in pain behave in much the same way as humans do and their behaviour is sufficient justification to the belief that they feel pain"

উপযোগবাদী বেন্থাম মনে করেন — মনুষ্যেতর প্রানীদের অনুভব ক্ষমতা আছে এবং আমাদের উচিৎ তাদের দুঃখ, কষ্ট লাঘব করা। প্রাণী হিংসার বিরুদ্ধে মনুসংহিতাতে বলা হয়েছে 'প্রাণী বধ স্বর্গ লাভের সহায়ক নয়, সুতরাং মাংস বর্জন করবে।'

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের 7,8,9 শ্লোকের মূল বক্তব্য আত্মারূপী ঈশ্বর সব সত্তার সার বিষয়। এছাড়া ও একাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ''এ বিশ্বের স্থাবর জঙ্গমাদি পদার্থ, দেবতা, ব্রহ্মা, ঋষি সকলে মিলে একত্রিত হয়ে এ বিশ্বের রূপ রচনা করেছে।' সুতরাং সকলেই স্বতঃ মূল্যবান। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে - সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মানি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ। অর্থাৎ যোগী পুরুষ সর্বভূতে নিজেকে এবং স্বীয় আত্মায় সবকিছু দর্শন করেন। আবার বেদান্ত চিন্তায় পাই — ''সর্বং খল্লিদং ব্রহ্ম'' অর্থাৎ এ মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম বা সচ্চিানন্দ স্বরূপ। ভালোবাসা, প্রেম কিংবা বন্ধুত্ব তো তখন উপলব্ধি হবে যখন কোন বিষয়ে মমত্ব অনুভব হবে। আর যখন কোন বিষয়ে ভালোবাসা হবে তখন তার সংরক্ষণে সচেষ্ট হবো। আর তাই মনুসংহিতায় প্রকৃতির প্রতি মানুষের কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য কতগুলি আচরনবিধি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

চরক সংহিতাতে বায়ু ও জল দূষণের প্রতিকারের উপায় বলা হয়েছে।

গঙ্গা প্রভৃতি নদীতে নোংরা আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ হয়েছে।

ভারতীয় দর্শনের ভাবনায় তাই বিশ্বগত সত্তার সঙ্গে একত্ব অনুভবই প্রকৃত সাশ্রয়ী, সংরক্ষণী দৃষ্টিভঙ্গি। তাই বিশ্বকবির ভাষায় ''বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো''

বলা বাহুল্য 'বসুধৈব কুটুম্ব' এর বাস্তু-অধ্যাত্মবাদ প্রকৃতিকে শোষণ, অপব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়, অল্পেতে আত্মতুষ্ট থাকার উপদেশ দেয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনীতে আরো বলেছেন, 'তপোবনের সাধনা হল প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।'

এখন প্রশ্ন হতেই পারে যে তাহলে আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণীদের যদি আমরা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ না করি (অর্থাৎ ধ্বংস) তাহলে আমরা বাঁচব কী করে। এর উত্তরে বলা যায় অবশ্যই তাদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করব শুধু খাদ্যের কিংবা অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে। শুধুমাত্র লোকের জন্য, স্বাদের জন্য, অর্থ লালসায় তাদের ধ্বংস করব না। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে যে প্রজাতির বিনষ্ট আমরা করব তার পরিপূরণ আমাদের আগে করতে হবে। দেখতেই ঐ হবে প্রজাতির বিলুপ্তি যাতে না হয় এবং এই পরিপূরণ আমার প্রয়োজনের তুলনায় শতগুন আগে পরিবেশে স্থাপন করতে হবে। তারপর গ্রহণ। অর্থাৎ না দিয়ে কোনকিছু গ্রহন করার মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে। ভারতীয় ঐতিহ্যবাদী স্মৃতি শাস্ত্র গুলিতে যে বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে তা হল — প্রাকৃতিক সম্পদ ছাড়া কোন দেশের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তবে যেহেতু প্রাকৃতিক সম্পদ সীমাহীন নয়, সেহেতু তাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে হবে। ঐ রূপ কর্তব্যপরায়ণতার মূলে হল আন্তরিকতা ও মূল্যবোধ। মানুষের অভাব অসীম। তাই সসীম সম্পদের সাহায্যে অসীম অভাবের পূরণ সম্ভব নয়। তাদের লক্ষ্য ছিল বিশ্বসংহতি যা ত্যাগ ও তপস্যা দ্বারা লাভ করা সম্ভব।

আবার প্রাণিজ খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে বলা চলে, যেক্ষেত্রে ঐ খাদ্য গ্রহণ না করলে জীবন একেবারেই

টিকে থাকতে পারে না কেবল সেক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু স্বাদ গ্রহণের জন্য অযথা প্রানের বিনাশ সাধন না করলে সেই প্রাণীর যেমন আনন্দ হয় তেমনি যে ব্যক্তি এ কাজ করে তারও ভালো হয়। ব্যক্তির মনে শুদ্ধভাবের জাগরণ হয়। শুদ্ধভাব জাগ্রত হলেই জগৎ আমার কাছে আরো সুন্দর, আনন্দ রূপে অনুভূত হবে। একটি প্রাণ বিনষ্ট করে যে আনন্দ তার চেয়ে ঐ প্রানকে স্বার্থকভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্যের মাধ্যমে বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভব হয়। ঐরূপ প্রাণ তথা জৈব সংরক্ষণের মানসিকতায় অসাধ্য ও সাধন হতে পারে। তাই ছোটবেলা থেকেই আমাদের বিষাক্ত সাপ না মেরে তা ধরার আধুনিক কৌশল যদি শেখানো হতো তাহলে আজকে বিভিন্ন সাপের অবলুপ্তি হত না। আজকে দেখা যায় মাঠে অতিরিক্ত ফলনের আশায় যে কীটনাশক প্রয়োগ করা হচ্ছে তার ফলে কিছু খারাপ কীট পতঙ্গের সাথে অনেক ভালো প্রজাতির বিনাশ ঘটছে, যার জন্য অনেক পাখির প্রজাতি অবলুপ্তি হয়েছে। গরুকে যে ব্যথানাশক ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়, পরে সেই গরু মারা গেলে তার মাংস খেয়ে শকুনের বিনাশ ঘটেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রয়োজনে প্রকৃতির স্বাভাবিক যে খাদ্যশৃঙ্খল তার ব্যাঘাত ঘটছে। একটির পর একটি প্রজাতির বিলুপ্তির পথে। তাই কীভাবে মানুষের স্বার্থরক্ষা করে Sustainable development করা হবে সেটাই এখন চ্যালেঞ্জের। প্রাকৃতিক এই শৃঙ্খলা বজায় না রাখলে মানুষের জীবনে হয়তো অনেক অর্থ-বিত্ত হবে, কিন্তু শরীর ও মনের উপযোগী খাদ্য, ঔষধি পাবে না। পরীক্ষাগারের রাসায়নিক ঔষধ খেয়ে একটি অসুখ সারাতে গিয়ে একাধিক দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই সরাসরি জৈব ঔষধ পাওয়ার জন্য সেগুলোকে তাই সংরক্ষণও করতে হবে। আর প্রয়োজনের তুলনায় একটুও সম্পদ যেন আমরা অপচয় না করি। জৈব-বৈচিত্র্য হ্রাসের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিশ্ব উষ্ণায়ন। এর মূল কারণও নগর সভ্যতার প্রতি মানুষের একান্ত অনুরাগ। কোন বিষয়ে মানুষ প্রতিষ্ঠিত হলে সে শহরমুখী হতে চায়। এই মানসিকতার পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। গ্রাম গুলিকে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে। রুক্ষ ভূমি তথা অব্যবহার্য জমিতে ব্যাপকহারে বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষ রোপন করতে হবে। আর কৃষিনির্ভর পরিবেশ বান্ধব ছোট ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে হবে। আর মানুষ যদি প্রত্যেকটি বিষয়ে প্লাস্টিক বর্জন করে জৈব উপাদান গ্রহণ করে তাহলে পরিবেশগত সুরক্ষা অন্যমাত্রায় পৌছাবে। তাই অন্যান্য জীব গোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের বৈরিতার অবস্থান না করে পরিপূরণকারী, মমত্ববোধের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে হবে। এই পৃথিবী মানুষের একার নয়। জন্মের পর মানব শিশু যতটা অসহায় অন্যান্য প্রাণীর শিশু এত অসহায় নয়।

একটা পিঁপড়ে যে পরিশ্রম ও সাশ্রয়ী হয়ে কর্ম করে, তা দেখে মানুষের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। একটি সিংহ ক্ষুধার্ত না থাকলে অন্য প্রাণীকে হত্যা করে না। কিন্তু মানুষ তার মাত্রাতিরিক্ত লোভ ও বিকৃত সৌন্দর্যবোধের জন্য অপ্রয়োজনেও জৈব সম্পদের ধ্বংস করে।

মানুষের কর্মকান্ড তার ভাবনা অনুযায়ী পরিচালিত। তাই ভাবনা যদি সঠিক দিকনির্দেশ পায় তবেই সাফল্য পাওয়া যাবে। তাই মানুষকে মনুষ্যত্বে তথা দেবত্বে উন্নীত করতে হবে। আর ঐ মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য প্রয়োজন সনাতন ধর্মের পাঁচটি মূল স্তম্ভ সম্পর্কে যথার্থ ভাবে অবহিত করা। এগুলি হল অহিংসা, অস্তেয়, শৌচ, সংযম, সত্য। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ মানব কল্যাণের জন্য যে শাস্ত্রদান করছেন, সেখানে বলা হয়েছে জন্ম থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত আমরা আমাদের অস্তিত্বের জন্য পিতা-মাতা, উদ্ভিদ-প্রাণী, তথা সমাজ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। তাই তাদের সফল ও সার্থক পরিচর্যার দ্বারা আমরা কিছু হলেও ঋণ শোধ করার চেষ্টা করতে পারি। তাই চিপকো কিংবা সাইলেন্টভ্যালির মতো আন্দোলন গড়ে তুলে এই জৈব-বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করতে পারি। শুধু দরকার সদিচ্ছার বাস্তবায়ন।

পড়াশোনার সেকাল ও একাল

কৃষ্ণপদ পাল, (অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ)

''মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,
বাদল গেছে টুটি ...''

রবিঠাকুরের ছড়া শিশুদের মনে, হৃদয়ে এক আকস্মিক দোলা দেয়। এই ধরনের ছড়া সন্ধ্যেবেলায় সমবেতভাবে শিশুরা গানের ভঙ্গিতে পাঠ করে আনন্দ বিহার করে। অনুভূতিগুলো বর্তমান যুগের শিক্ষার্থীদের ইঙ্গিত দিচ্ছে না; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যদিও বর্তমান প্রজন্মের শিশুরা তাদের পাঠকার্য এই রীতিতে সুসম্পন্ন করে না। রবীন্দ্রনাথের কথায় -

'হেতা হতে যাও পুরাতন
হেতায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে'।

রবি মামা উদীয়মান হওয়ার প্রাক্ মুহূর্তে সন্তানের পাঠকার্যারম্ভের নিমিত্তে বাবা-মা তার শিশুদের আদর করে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিতেন। কিছু কিছু বাড়িতে অবশ্য ঘুমকাতুরে শিশুর দুর্বল মানসিকতার অবকাশে বাবা মায়েরা বেত্রাঘাত করতে বাধ্য হতেন। খুব অল্প সংখ্যক আভিজাত্য সম্পন্ন বাড়িতেই শোনা যেত এলার্ম এসেছে আধুনিক মোবাইল ফোনে। কিন্তু তার ব্যবহার কতটুকু হয় তা বলাই বাহুল্য। শীতকালে সোনালী রৌদ্রের পরশ পেতে শিশুরা চাটাই বা মাদুরে উপবেশন করে তাদের পাঠকার্য আরম্ভ করত। আধুনিক যুগে এসে আমরা প্লাস্টিকের তৈরি মাদুর বা ম্যাটের রমরমা বাজারের চাকচিক্যতায় হারিয়ে ফেলেছি খেজুর পাতায় বোনা চাটাই এর ব্যবহার যোগ্যতা। বর্তমানে যুগের অধিকাংশ শিক্ষার্থী অজ্ঞাত এই সম্পর্কে; শুনলেও তারা অবাক হয় এবং তাচ্ছিল্যের নজরে তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। যুগটা অবশ্যই বদলেছে, বদলেছে আচার ব্যবহার এবং নিয়ম নীতি।

শ্যামসুন্দরপুর পাটনা হাইস্কুলের পাঠকার্যের সান্নিধ্যে 'পাহাড়ী বাগান' নামের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। অনেক স্মৃতি বিজড়িত এই বাগান সমকালীন যুগে একটি জঙ্গল মাত্র। স্কুলে যখন পড়তাম প্রত্যেক ক্লাসে একজন করে মনিটর থাকতো। এই মনিটর শিক্ষক মহাশয়ের আদেশানুসারে ওই পাহাড়ী বাগান থেকে একটি দেবদারু শাখার ছড়ি সংগ্রহ করে আনতেন। পড়া ধরার ভয়েতে অনেকেই পেছনের বেঞ্চে বসত। কিন্তু শিক্ষকমশায়ের দৃষ্টির বাইরে কোন শিক্ষার্থী যেতে পারত না। ঠিক মৎস্য শিকারের ন্যায় জালে ধরা পড়তো পড়াশোনাতে অনীহারত ছাত্ররা। তৎকালীন সময়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রদের স্কুল ড্রেস ছিল নীল ব্লু হাফ প্যান্ট এবং সাদা জামা। হাফ প্যান্টের তাগিদে ছড়ির আঘাত ভীষণ বেদনাদায়ক হত। লজ্জায় কাউকে নিজের কথা প্রকাশ করা না গেলেও সকলের বোধগম্যতার কারণবশতঃ বাড়িতেও আবার এক অশান্তির ঝড়ের সমারোহ হতো। শিক্ষার্থী সচেষ্ট হত পরের দিনের পাঠকার্যে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হওয়ার। কিন্তু এই আধুনিক সমাজের শিক্ষকদের হাতে ওই পাহাড়ী বাগানের ছড়িটা বোধহয় ওঠে না। আর সেই জন্য ছাত্রদের শরীরে ছড়ির দাগের লেশ মাত্র দেখা যায় না। সেইসঙ্গে পড়ার ভীতি তো দূরের কথা শিক্ষকদের সামান্য সম্মানটুকুও আজ বিলীন হতে বসেছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়।

আধুনিক যুগের চাকচিক্য-জৌলুসে হারিয়ে গেছে অনেক নস্টালজিক নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী। বাল্যবয়সে ''মাংলাই মৌচাক সেবাশ্রমে'' দৃষ্টিগোচর হতো কিছু ঘটনা। পাড়ার কচিকাঁচারা একটি হ্যারিকেন হাতে করে নিয়ে প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা যেত পড়াশোনা করার জন্য। গরিব বাবা - মায়েদের অর্থের কিছুটা ঘাটতি মিটত ওই পাঠশালায় পড়তে যাওয়ার সুবাদে। সেখানে অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর দাদারা পড়াতেন ভাই বোনেদের। ওখানকার সবথেকে

বড় ঐতিহ্য ছিল কেরোসিন তেলে দাহ্য হ্যারিকেন; যেটা শুধুমাত্র বইয়ের পাতায় মনোযোগের আকর্ষণের জন্য বোধ হয়। কারণ ঐ আলো শুধুমাত্র সামনের বইখাতা ছাড়া দূরের কিছু বস্তু দৃষ্টিগোচর হতো না। এতে শিক্ষার্থীদের মনযোগ থাকতো বইয়ের পাতায়; বাইরের যে কোন দৃশ্য তাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকতো। সেই পাঠশালা থেকেও কত ধ্রুবতারা তৈরি হয়েছে মানব জীবনাকাশে।

ছোটবেলায় বাংলা সাহিত্যের রচনা পড়তাম বিজ্ঞান ''আশীর্বাদ' না অভিশাপ''। এর তাৎপর্য বা বিশ্লেষণ আমার মত অল্পজ্ঞ মতির কাছে মরীচিকা। আমরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী হিসেবে বিবেচিত। হতো চিঠির মাধ্যমে বা সশীরীরে আগমনে। বিবর্তনের ধারাকে অব্যাহত রেখে প্রথমে টেলিফোন ফ্যাক্স সংযোজন এতাই; এ প্রসঙ্গে সৌরেন বাবুর একটা আবৃত্তি মনে পড়ে গেল -

''তোমানে মানো আর নাই মান দেশটা কিন্তু আগাইঠে।''

যোগাযোগের সমকালীন পর্যায়ে যখন আমরা চাঁদের বার্তা সংগ্রহ করছি। ঠিক সেই রকম যোগাযোগের মাধ্যমে একজন শিক্ষক যখন তার মেসেঞ্জারে অনামি এক নাম্বার থেকে বার্তা পায় - ''স্যার এই নোটসটা পাঠান তো দরকার আছে।'' তার মত দুর্ভাগ্য শিক্ষক বোধ হয় সেযুগে ছিল না। এখানেই বোধহয় রচনার টপিকটা প্রাসঙ্গিক ছিল ''..... আশীর্বাদ না অভিশাপ''। হ্যাঁ আপনারা বুঝতেই পেরেছেন আমি সম্পর্কের কথা বলছি সম্পর্কগুলো কোথাও বোধ হয় আলগা হয়ে গেছে। যেন ক্ষীণ হতে হতে একদম বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। আর সেই বিন্দু জোড়া লাগালেও আর সরলরেখা হয় না। রবি ঠাকুর তার ''সাহিত্যের পথে'' নামক প্রবন্ধে আধুনিকতা প্রসঙ্গে বলেছেন —

''নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে।
সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিঁধে চলে না;
যখন সে বাঁক নেয়,
তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন।
বাংলায় বলা যাক আধুনিক।''

রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় অনুমান করেছিলেন যে একদিন এই পৃথিবী আধুনিক চাদরে আবৃত হবে। আলগা হবে সম্পর্কের বাঁধন। যেমন পাতাল রেল আবিষ্কারের পূর্বেই কোন এক কবি পাতাল রেলের কথা প্রকাশ করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্বর্গীয় নির্মল চন্দ্র মাইতির অনুপ্রেরণায় এই এলাকার শিক্ষার প্রসার হয়তো হয়েছে। অস্বীকার করার জায়গা নেই; কিন্তু তাঁর প্রয়াণে শিক্ষার সবুজ উদ্যানে তৈরি হয়েছে শিষ্টাচার এবং সংস্কৃতির মরীচিকা। যে মরীচিকা আমরা প্রত্যক্ষ করছি অবিরত। আমরা যারা মাস্টারমশাইয়ের উপস্থিতিতে কোন ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক অসংযত আচরণ করতে সাহস পেত না। বোধহয় শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় কাজ করতো প্রত্যেকের মধ্যে।

বর্তমানে ইন্টারনেটের সহযোগিতায় হস্ত টিভিতে (মোবাইল) দেখতে পাই ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের রৈখিক চিত্র সংবাদ। সেই সংবাদ বোধহয় আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে তার রূপ বদলাচ্ছে। শিক্ষক যদি কোন ছাত্রকে ভালো কিছু শেখার উপদেশ দেন তা কর্ণপাত হয় না। এটা বোধহয় গোড়ায় গন্ডগোলের কারণ। একটি বীজকে যদি জমিতে লাগানোর পর ঠিকঠাক ভাবে পরিচর্যা করা না হয়; তাহলে সেই বীজ বৃক্ষ থেকে মহীরূহতে পরিণত হতে পারে না। আবার মহীরূহতে পরিণত না হলে পরিবেশের কোন কাজে লাগে না; তা অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। ঠিক সেই রকম মানব শিশুকে জন্মাবার পরমুহূর্তে যদি পরিবার - পরিজন ঠিকভাবে পরিচর্যা না করে; তাহলে সেই শিশু পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে অসমর্থ হবে। এবং অনায়াসেই সে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হবে। এই অসামাজিক পরিবেশ তৈরি হওয়ার আগে আমাদের সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। একটা ফুল

অচিরেই ঝরে যাওয়ার আগে তার পাপড়িগুলোকে শক্তপোক্ত করে বৃন্তের সঙ্গে আটকে রাখতে হবে এটাই তো পৃথিবীতে মনুষ্য রূপে জন্মানোর প্রথম কর্তব্য। নচিকেতার একটা গান খুব মনে পড়ে —

''একদিন ঝড় থেমে যাবে পৃথিবী আবার শান্ত হবে।''

রামকৃষ্ণদেবের একটি ছোট্ট কথা সবাইয়ের অজানা নয় - ''টাকা মাটি মাটি টাকা''। আধুনিক সমাজের জৌলুস এবং আধিপত্যের দাম্ভিকতায় এই টাকা মাটির বিচার করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছি প্রকৃত শিক্ষার কথা। এই শিক্ষা টাকার থেকেও অনেক বেশি মূল্যবান। এখন শিক্ষাকে টাকার সঙ্গে দরদাম করতে দেখা যায়। স্নাতকোত্তর পাশ বেকার যুবক যুবতীরা অবজ্ঞার শিকার হয় অষ্টম শ্রেণী পাস টাকা মাটির চাকরির কাছে। এমন অভিব্যক্তি প্রকাশ করে যেন তারা নিজের যোগ্যতায় চাকরিতে প্রবেশ করেছে। বর্তমান অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় গুলিতে এই টাকা নামক মাটির পরিবর্তে পাশ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ আদর্শ শিক্ষক হওয়ার ব্রত শেখানো হয়; সেখানে তারা এইভাবে উত্তীর্ণ হয়ে সমাজকে দুষিত করছে। ফলত সমাজে অনেক ভেজাল শিক্ষকের আবির্ভাব হচ্ছে এই মাটির দৌলতে। কারণস্বরূপ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে সুন্দর প্রকৃতির সম্পর্ক তা আলগা হয়ে যাচ্ছে; অপরপক্ষে এনসিটিই নিয়ম নির্ধারিত শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পাঠদান এবং আচরণের মেলবন্ধনে কঠোর মনোভাবাপন্ন শিক্ষক মহাশয়ার নরম সুলভ আচরণ প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। একদিকে যেমন মেধাবী ছাত্রদের প্রকৃত শিক্ষার দিকে আগ্রহ বর্ধমান হচ্ছে; অপরদিকে নিম্নমানের ছাত্ররা বিপথগামী হচ্ছে। ফলত সমাজ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। যেদিন থেকে শিক্ষকের হাতে ওই ছড়ি নামক অস্ত্রটিতে তালাবন্ধ করা হয়েছে; সেই দিন থেকে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর আচরণ ছাত্রসুলভ আচরণ পরিত্যাগ করে অসঙ্গত আচরণে বাঁক নিয়েছে। তার এই দুঃসাহসিক অগ্রগতিকে যদি যথাসময়ে বাধাপ্রাপ্ত না করা হয় তাহলে এর ফল ভুগতে হবে গোটা সমাজকে। 'মাৎস্যন্যায়' রূপ নেবে গোটা সমাজ ব্যবস্থায়। অচিরেই ধ্বংস হবে গোটা পৃথিবী। রবীন্দ্রনাথ তার 'সোনার তরী' কাব্যের 'বর্ষ-যাপন' কবিতায় উল্লেখ করেছেন — 'বর্ষযাপন'

''ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা।
নিতান্ত সহজ সরল।
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারটি অশ্রু জল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা।
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে।
শেষ হয়ে হইল না শেষ
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত।
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল
অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্তির ধুলা।
কত ভাব কত ভয় ভুল।''

মহাশ্বেতা দেবীর রচনায় মাটি ও মানুষের কথা

অনুশ্রী মাইতি দাস পাত্র, (অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ)

''না এদেশ শুধু মৃত্যু উপত্যকা নয়, এদেশে লড়াই আছে,
জীবনের গান গাওয়ার ইতিহাস আছে, স্বপ্ন আছে,'' — মহাশ্বেতা দেবী (খড়্গপুর বইমেলা, ২০০৮)

হারিয়ে যাওয়া সময়ের মধ্যথেকে যে ক'জন দুর্দম সংগ্রামী মানুষের কথা জানি, তাঁদের একজন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর অন্তিম লড়াইটি শেষ করলেন ২০১৬ সালের ২৮শে জুলাই, বয়স ৯০। তাঁকে মূলত সমাজকর্মী, ঔপন্যাসিক সঙ্গে সাংবাদিক হিসেবে জেনেছে মানুষ। তাঁর সম্পর্কে বলা যায় তিনি বাংলার সবচেয়ে মান্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের একজন।

মহাশ্বেতা দেবী জীবনের শেষদিন পর্যন্ত একেবারে প্রান্তিক ও নিপীড়িত শ্রেণীর মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য চেষ্টা করে গিয়েছেন। যারা পরিযায়ী, সর্বহারা, যারা উপজাতি বা দলিত, যাদের কার্যত অপরাধী বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়, যাদের কথা বিশেষভাব কারো দাবি দাওয়ার মধ্যে আসে না, তারাই ছিল তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন, সরকারকে রিপোর্ট করেছেন। তাদের সংগঠিত করেছেন, বঞ্চনার অনুভূতি থেকে তাদের জন্য মামলা করেছেন এবং প্রকৃত অবস্থান জনসাপেক্ষে তুলে ধরার জন্য লিখেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামের সংবাদ জেনেছেন পথে-প্রান্তরে ঘুরতে ঘুরতে, সেখানে ক্ষমতা ও শাসনের বিভিন্ন কাঠামোর পরিচয় লাভ করেছেন, নিজেকে একাত্ম করেছেন যারা অধিকার বঞ্চিত তাদের সঙ্গে, সেই নীচের মহল থেকেই তিনি খুঁজে নিয়েছেন তাঁর উপন্যাস ও গল্পের উপাদান। তাই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে তিনটি পর্ব যেন সুলক্ষিত।

তাঁর প্রথম পর্বের লেখালেখি প্রসঙ্গে বলতে হয় তিনি গল্প উপন্যাসে ইতিহাসের আলোকে রাজনীতি, অর্থনীতির সাথে সাথে লোকায়ত সংস্কৃতি ও লোকায়ত জীবন ব্যবস্থাকে উপস্থাপন করেছেন। প্রথম পর্বের উল্লেখযোগ্য রচনা/উপন্যাস - 'নটি' - (১৯৫৯), 'মধুরে মধুর' (১৯৫৮), 'প্রেমতারা' (১৯৫৮), কবি বন্দ্যঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৭)।

মহাশ্বেতা দেবীর সুদীর্ঘ সাহিত্য ও সমাজকর্মী জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ (ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া), বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তীশগড় রাজ্যের প্রান্তিক কৃষিজীবী, শ্রমিক ও অরণ্যকর্মী দলিত শ্রেণীর নারী ও পুরুষদের সাথে। তিনি তাঁর তৃতীয় পর্বের সাহিত্যকর্মে অন্ত্যজ শ্রেণীর দলিত মানুষের ইতিহাস, দৈনন্দিন জীবন ও দলিত হওয়ার কাহিনী তুলে ধরেছেন। দলিত, শোষিত ও বঞ্চিত শ্রেণীর অনুসন্ধানকৃত লব্ধ জ্ঞানের আলোক তিনি তাঁর তৃতীয় পর্বের গল্প উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণীর আদিবাসীদের জীবনের নানা দিক উপস্থাপন করেছেন। তিনি মানস পরিবর্তনের জোরালো পর্বে উপন্যাসে ও গল্পে বৈশিক, ভৌগলিক ও ভারতীয় রাজনীতির পরিবর্তনের ধারায় আদিবাসী জীবনের পরিবর্তনকে তুলে ধরেছেন। 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), অরণ্যের অধিকার (১৯৭৫), চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর (১৯৮০), বীরসা মুণ্ডা (১৯৮১), অক্লান্ত কৌরব (১৯৮২), সুরজ গাগরাই (১৯৮৩), টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা (১৯৮৭), ক্ষুধা (১৯৯২), কৈবর্ত খন্ড (১৯৯২), মার্ডারের মা (১৯৯২) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা ছোটগল্পের সংকলন

গুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২), 'ইটের পরে ইট' (১৯৮২), হরিরাম মাহাতো (১৯৮২), সিধু কানুর ডাকে (১৯৮৫) ইত্যাদিতে সাম্রাজ্যবাদী ও এদেশীয় সামন্ততান্ত্রিক শক্তির শোষণের চিত্রের সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তুলে ধরেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর নতুন স্বাদের উপন্যাস হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয় – ''কবি বন্দ্যঘটী গাঞীর জীবন ও মৃত্যু''। বলা যায় এই উপন্যাস থেকেই মহাশ্বেতা দেবীর ভাবনার কেন্দ্রীয় অবস্থানে চলে আসে আদিবাসী মানুষজন। পরবর্তীকালে তিনি আদিবাসী জনজীবনকে বেছে নিয়েছিলেন, সে উপন্যাসগুলো প্রধানত দুটি ধারায় প্রবাহিত হতে দেখা যায়। প্রথমতঃ ইতিহাস আশ্রিত বীরের পুনর্নির্মান; দ্বিতীয়তঃ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষজনের দ্বারা আদিবাসী সমাজের চালচিত্র নির্মাণ।

'কবি বন্দ্যঘটী গাঞীর জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসে ষোড়শ শতকের মেদিনীপুর ও তার চারপাশের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে 'চুয়াড়'দের জনজীবন ও স্বজাতি প্রীতির কথা।

মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' (১৮৫৭) উপন্যাসটি বীরসাইত মুণ্ডাদের অভ্যুত্থানের কাহিনী নিয়ে রচিত। এই উপন্যাসে মুণ্ডাদের বিদ্রোহ ছিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে। এই শোষক বিদেশী নয়, ভারতের ভিন্নভাষী, ভিন্নবর্গের মানুষ বাঙালি, বিহারি, রাজপুত, মাড়োয়ারি, পাঞ্জাবি ব্যবসায়ী ও জমির মালিক - আদিবাসীদের ভাষায় 'দিকু'। 'দিকু'দের সুদের জালে আদিবাসীরা নিঃস্ব ও ভূমিদাসে পরিণত হয়। খাদ্য, বাসস্থান হারিয়ে শোষণের পীড়নে মুণ্ডারা তির, টাঙ্গি, বর্শা হাতে নিরুপায় হয়ে প্রশাসনের বন্দুকের গুলির সামনে এসে দাঁড়ায়। মহাশ্বেতা দেবী 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে মুণ্ডাদের এই বিদ্রোহের চিত্রটিই জীবন্ত করে তুলেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর মতে তার লেখা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর'। লালমাটির দেশ ম্যাকলাস্কিগঞ্জ (বিহারের পালামৌয়ে) জনজীবনের পটভূমিকায় তিনি এই বিখ্যাত উপন্যাসটি লেখেন। ওখানকার বাসিন্দাদের জীবন সংগ্রামের কথা বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে ধরছেন এই উপন্যাসে। এই উপন্যাসের নায়ক চরিত্র চিত্রিত হয়েছে প্রত্যক্ষ দর্শন থেকে। ঝাড়খণ্ডের গ্রামীণ মেলের তীর ছোঁড়ার এক মেলায় লক্ষ্য ভেদী তীরন্দাজ চোট্টি। তারা চিরকালই নিগৃহীত হয়েছে অস্পৃশ্য হিসেবে। তাদের অধিকাংশই আজও এখানে মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি।

মহাশ্বেতা দেবী বাংলা সাহিত্যের একটি সুদীর্ঘ পথ হেঁটেছেন। বিষয়ের বহুমাত্রিকতা এবং দেশজ আখ্যানের অনুসন্ধান করে। তার সেই খুঁজে বের করা আখ্যানে তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন ব্যতিক্রমী জনপদের সাহিত্য। সে সাহিত্য কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য কেবল মাত্র সাহিত্য হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে ইতিহাস। তিনি বীরসার কথা সবাইকে জানাতে চান। অরণ্যের অধিবাসীদের বেঁচে থাকার লড়াইকে তিনি 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তিনি মুণ্ডা জনগোষ্ঠী থেকে তার উপন্যাসের নায়ক বীরসাকে সৃষ্টি করেছেন। সামাজিক দায়বোধ থেকে তিনি তাঁর সেই উপেক্ষিত ইতিহাসের নায়কদের তুলে এনেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখিকার উক্তি - ''লেখক হিসাবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসাবে, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ। দায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখনোই ক্ষমা করেনা। আমার বিরসা কেন্দ্রিক উপন্যাস সে অঙ্গীকারেরই ফলশ্রুতি।''

মহাশ্বেতা দেবী আজীবন সংগ্রামী চিন্তাচর্চা করেছেন এবং দেশ ও মানুষ সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত হবে সেই লক্ষ্যে সাহিত্য রচনা করেছেন।

পশ্চিমবাংলার উপজাতি জনগোষ্ঠী এবং নারীদের আর্তনাদ তুলে ধরার জন্য মহাশ্বেতা দেবী একসময় খ্যাতি লাভ করেন। 'নৈঋতে মেঘ', 'অগ্নিগর্ভ', 'হাজার চুরাশির মা' 'প্রতি চুয়ান্ন মিনিট', '৬ই ডিসেম্বরের পর', প্রভৃতি। এই সব গল্প উপন্যাসে তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামরিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে যেমন আদিবাসী প্রতিবাদী চরিত্র চিত্রিত করেছেন, তেমনি এদেশীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোষণের প্রতি প্রতিবাদী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর তুলে ধরেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর বিশিষ্টতা এই যে তিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক আদিবাসী জীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের ইতিহাস থেকে চরিত্র নির্মান করেছেন। আদিবাসী সংগ্রামের এবং ভারতীয় সংগ্রামের ইতিহাস থেকে বিপ্লবী এবং বীরের চরিত্র নিয়ে আসেন, যা বাংলা সাহিত্যের সংগ্রামী চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করেছে। পরিশেষে বলা যায় – ''আদিবাসী অন্ত্যজ শ্রেণীর দলিত মানুষের একান্ত আপনজন মহাশ্বেতা'' – মনোজিৎ কুমার দাস।

তথ্যসূত্র ঃ-

১. 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' — তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়।
২. 'এক জীবনেই' (স্মৃতিকথা সংগ্রহ) — মহাশ্বেতা দেবী (সংকলন ও সম্পাদনা অজয় গুপ্ত)।
৩. আনন্দবাজার পত্রিকা।
৪. এইসময় পত্রিকা (রবিবারোয়ারি)।
৫. 'মহাশ্বেতা ও সমকালীন বঙ্গ' — সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।
৬. 'কাহিনীকার মহাশ্বেতা' — স্বপ্নময় চক্রবর্তী।
৭. তথ্যচিত্র মহাশ্বেতা — জোসি যোসেফ।

রাজরোষে যুগান্তর

তন্ময় রায় (অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ)

উপনিবেশিক ভারতবর্ষে উনবিংশ শতকের অন্তিম লগ্নে মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হলেও বাংলা ছিল তার প্রাণ কেন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ -এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশমাতৃকার মুক্তির উদ্দেশ্যে বাংলার তরুণ দল বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নারায়ণ বসুর অনুপ্রেরণায় এবং নবগোপাল মিত্র'র 'হিন্দু মেলা'র উদ্যোগে ব্যায়াম ও শরীর চর্চার মাধ্যমে বাংলার যুব সমাজের মধ্যে বিপ্লববাদী কার্যকলাপের প্রস্তুতি শুরু হয়। বিপ্লবী আদর্শ প্রচারের জন্য তাঁরা 'ভবানী মন্দির', সোনার বাংলা', 'No Compromise', 'রাজা কে?' প্রভৃতি ইস্তাহার ও পুস্তিকা প্রকাশ করেন। অবশেষে অরবিন্দ ঘোষের পরামর্শ ও ভগিনী নিবেদিতার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত -এর উৎসাহে ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই নামটি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাস থেকে গ্রহণ করা হয়। সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'যুগান্তর' এর প্রবন্ধাবলী এমন বলিষ্ঠ ভাষায় জাতীয় স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে রূপ দিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই জনমানসে ও সরকারী মহলে ওই পত্রিকা এক প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য জেহাদ ঘোষণা করে 'যুগান্তর' পত্রিকা।

১৯০৭ সালের মধ্যভাগ থেকে বাংলায় সংবাদপত্র দলনের সরকারী অভিযান শুরু হয়। প্রথম সরকারী কোপ পড়ল 'যুগান্তর' পত্রিকার উপর। ৭ ই জুন তারিখে বাংলা সরকার 'যুগান্তর' এর সম্পাদককে সতর্ক করে পত্র লেখে যে, ভবিষ্যতে হিংসা-উদ্দীপক প্রবন্ধ পত্রিকায় বের হলে এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করা হবে। সরকারী এই হুমকি যুগান্তর সাধকদের তাঁদের কর্তব্য থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। ১৯০৭ এর ১৬ ই জুন 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'নাই ভয়' ও 'লাঠৌষধি' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রবন্ধে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে একটা প্রকাণ্ড ভাঁওতা বলে বর্ণনা করা হয়। বলা হয় এটা চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত একটা চকচকে সৌধ বিশেষ। সামান্য আঘাত দিলেই তা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তবুও যে তা এখনও হয়নি তার কারণ আমাদের ক্লৈব্য ও ভীরুতা। দ্বিতীয় প্রবন্ধে ঘোষণা করা হয় যে, ইংরেজ শাসকেরা আবেদন-নিবেদনের ভাষা বোঝেন না, তাঁরা কেবল বোঝেন লাঠির ভাষা – যার প্রয়োগ না হলে নির্বোধদের চৈতন্যোদয় ঘটে না। পাঞ্জাবের সরকার-বিরোধী হিংসাত্মক কর্মনীতিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে ওই প্রবন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করা হলো যে, ''কাবুলী দাওয়াই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ দাওয়াই''।

পরবর্তী ঘটনা ৩ রা জুলাই ১৯০৭ তে। পুলিশ 'যুগান্তর' কার্যালয়ে গিয়ে খানাতল্লাসি চালায়। ৫ ই জুলাই 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়েছে জানতে পেরে নিজেই 'যুগান্তর' পত্রিকার অফিসে এসে স্বেচ্ছায় পুলিশের কাছে ধরা দেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ১২৪-এ ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের মামলা খাড়া করা হলো ১৯০৭ সনের ১৬ ই জুন। 'যুগান্তর' এর পূর্বোল্লিখিত দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য প্রথম 'যুগান্তরের' বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথ আদালতের সামনে এক স্মরণীয় বিবৃতি রাখলেন। সেই বিবৃতিতে আত্মপক্ষ রক্ষার কোনো চেষ্টা না করে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, ''আমি সরল বিশ্বাসে আমার দেশের প্রতি কর্তব্য বিবেচনা করে যা শ্রেয় বুঝেছি, তাই করেছি। যে কথা অস্বীকার করার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই, তা প্রমাণ করবার জন্য আমি মামলা রুজুকারীদের অনর্থক

শক্তিক্ষয় ও অর্থক্ষয় ঘটাতে চাই না। আমি আর কোনো বক্তব্য রাখতে বা এই বিচারে আর কোনো অংশ নিতে ইচ্ছুক নই'।

রাজদ্রোহের অভিযোগে ভূপেন্দ্রনাথ অভিযুক্ত হলেন। ২৪ শে জুলাই, ১৯০৭ সালে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডি.এইচ. কিংসফোর্ড 'যুগান্তর' মামলায় রায় দিলেন। ভূপেন্দ্রনাথের জন্য এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড নির্দিষ্ট হলো। ভূপেন্দ্রনাথ সহাস্যবদনে কারাবরণ করলেন। আত্মাত্যাগের সাধনায় স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্য ভাই বলে বাঙালী সমাজ ও ভারতবাসী ভূপেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় পেলো। ২৫ শে জুলাই 'বন্দেমাতরম্' পত্রে স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ ভূপেন্দ্রনাথের কারাবরণ উপলক্ষ্যে ''One Mor For the Altar'' নামক এক ছোট্ট সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ভূপেন্দ্রনাথের তেজোদৃপ্ত ও বলিষ্ঠ আচরণের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে তিনি আরও একটি বড় সম্পাদকীয় প্রকাশ করলেন। 'অমৃতবাজার' পত্রিকা সহ কয়েকটি নরমপন্থী পত্রিকা বাদ দিলে বাংলার জাতীয়তাবাদী সকল পত্রিকাই ভূপেন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি করলো।

অত্যাচারী শাসকের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে হাসিমুখে কারাবরণ করে ভূপেন্দ্রনাথ স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে যে নব অধ্যায় সৃষ্টি করলেন, জাতীয় ইতিহাসে তা অবিস্মরণীয়। ইংরেজ সরকার ভেবেছিল ভূপেন্দ্রনাথকে কারাগারে নিক্ষেপ করলে 'যুগান্তর' এর মনোবল একেবারে ভেঙে যাবে। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথকে কারাবদ্ধ করেও ইংরেজ সরকার 'যুগান্তর' এর মনোবল এতটুকু ভাঙতে পারেনি। বরং অত্যাচারীর নিষ্পেষণ 'যুগান্তর'কে নতুন করে প্রাণশক্তি ও আত্মগরিমা সঞ্চার করেছিল। নতুন সংকল্প নিয়ে নতুন উদ্দীপনায় 'যুগান্তর' পত্রিকা আবার প্রকাশ হতে লাগলো। শ্রীঘ্রই 'যুগান্তর' পত্রের উপর দ্বিতীয়বার সরকারী কোপ পড়লো। 'যুগান্তরে'র কর্মাধ্যক্ষ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য 'মিথ্যা ভয়' ও 'সিডিসন ও বিদেশী রাজা' (৩০ শে জুলাই, ১৯০৭) এবং 'মিথ্যার পূজা' (৫ ই অগাস্ট, ১৯০৭) শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য ভারতীয় দন্ডবিধির ১২৪-এ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হলেন। 'মিথ্যা ভয়' প্রবন্ধে লেখা হল, ''কাণাকে কাণা বলিলে কাণার আর রাগের সীমা থাকে না। যাহার যেখানে ব্যথা সেখানে হাত পড়িলে সে ভারতে ইংরেজ সরকারেরও সেই দুর্দশা। ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি যে এদেশে কত ক্ষীণ তাহা ইংরেজ প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝে; আর বুঝে বলিয়াই সে প্রকান্ড আড়ম্বরের মধ্যে আপনার দুর্বলতা লুকাইয়া রাখিতে চায়; গোটাকতক ফৌজ, তোপ, লাল পাগড়ীর ভড়ং দেখাইয়া দেশের লোককে স্তম্ভিত করিতে চেষ্টা করে। ইংরেজ রাখিতে চায়, লোকে যেদিন সন্দেহ করিবে যে এ তাসের ঘর, সমগ্র ভারতবাসীর এক ফুৎকারও সহ্য করিতে সমর্থ নয়, সেদিন ইংরেজ রাজত্বের অবসানের সূত্রপাত''। এই প্রবন্ধের রচয়িতা খুব সম্ভবত ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'মিথ্যার পূজা' প্রবন্ধটি? ঘোষের রচনা। উক্ত প্রবন্ধে অরবিন্দ লিখলেন, ''ভূপেন্দ্রনাথকে জেলে দিয়া ফিরিঙ্গী সরকার ভাবিয়াছিল এইবার তাহারা 'যুগান্তরে'র উত্থানশক্তি একেবারে রহিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু 'যুগান্তর' আবার বাহির হইল। .... 'যুগান্তর'-এর আবার সম্পাদক কে? 'যুগান্তর' তো জাতীয় ভাবসমষ্টি মাত্র। লোকের প্রাণের ভিতর দিয়া যে ভাবস্রোত ছুটিয়াছে তাহার এক একটা কণামাত্র যুগান্তরে আসিয়া ধাক্কা লাগে। সম্পাদক তাহা অভিব্যক্তির যন্ত্রমাত্র। যন্ত্রকে ধরিলে যন্ত্রীও ধরা পড়ে না; যন্ত্র যে অশরীরী। ঐ যে পালে পালে উন্মাদ বালকের দল 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অজানা লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে, ঐ যাহারা নৃমুন্ডমালিনীর খপর তলে আত্মবলিদান দিয়া অমরত্ব লাভের জন্য উৎসুক — তাহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে; তাহারই যুগান্তরের সম্পাদক।''

১৯০৭ সনের ২ রা সেপ্টেম্বর বিচারপতি মিঃ কিংসফোর্ড 'যুগান্তর' এর দ্বিতীয় মামলার রায় প্রদানকালে উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, ''প্রবন্ধগুলি অতিরিক্ত মাত্রায় রাজদ্রোহমূলক এবং ব্রিটিশ ভারতে আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেন্টের প্রতি ঘৃণা, শত্রুতা ও বিদ্বেষের মনোভাব জাগ্রত করাই এগুলির উদ্দেশ্য।.... এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করে এরূপ সিদ্ধান্তে না এসে পারা যায় না যে, অজ্ঞ ও বিপথে পরিচালিত জনগণকে গভর্ণমেন্ট ও তার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কর্মে ও বিদ্রোহে উস্কানি দেবার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই এ পত্রিকা পরিচালিত হয়; এবং এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে এই পত্রিকা আইনের আশ্রয়ে টিকে থাকতে পারে।'' ম্যাজিস্ট্রেট আরও বলেন, ''বর্তমান মামলার প্রবন্ধগুলি পূর্ব-মামলার প্রবন্ধগুলি অপেক্ষা আরও বেশী উত্তেজনামূলক বিচারপতির রায় অনুসারে অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মুক্তি লাভ করেন, কিন্তু বসন্তকুমার ভট্টাচার্যের দুবছর সশ্রম কারাদন্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়।

সরকারী নিষ্পেষণের চাপের সামনে 'যুগান্তর' দ্বিতীয় মামলার পরও নির্ভীকভাবে দেশের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করে চলে। ১৯০৭ সনের অক্টোবর মাসের শেষাশেষি 'যুগান্তর' পরিচালনার দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়। হস্তান্তরের পরেও 'যুগান্তর' এর অগ্নিগর্ভ প্রচার কার্য অক্ষুণ্ণ রইল। ১৪ ই ডিসেম্বর, ১৯০৭ সনে 'হিন্দুবীর্য পঞ্চানদে' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে 'যুগান্তর' এর বিরুদ্ধে তৃতীয়বার রাজদ্রোহের মামলা উপস্থাপিত হলো। মুদ্রাকর ও প্রকাশক বৈকুণ্ঠচন্দ্র আচার্য গ্রেপ্তার হলেন। ১৯০৮ সালের ১৬ ই জানুয়ারি বিচারক কিংসফোর্ড তাঁর রায়ে বৈকুণ্ঠচন্দ্রের এক হাজার টাকা জরিমানা ও দুই বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিলেন। রায় প্রদানকালে বিচারক বললেন এই প্রবন্ধটির লক্ষ্য হলো শিখ সৈন্যগণকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে উত্তেজিত করা। তিনি আরও মন্তব্য করলেন, দেশের সুশাসন ও সুশৃঙ্খলার স্বার্থে পত্রিকাখানিকে অনেক দিন পূর্বেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল।

বৈকুণ্ঠ চন্দ্র আচার্যের কারাগমনের পর ফণীন্দ্রনাথ মিত্র 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং একই ধাঁচের বিদ্রোহাত্মক রচনাবলী যুগান্তরে বের হতে থাকে। ৪ ঠা এপ্রিল; ১৯০৮ সনে 'যুগান্তর' পত্রে ইংলিশম্যানের অত্যাচার' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে ফণীন্দ্রনাথ মিত্র এপ্রিল মাসে অভিযুক্ত হলেন এবং ভারতীয় দন্ডবিধি অনুযায়ী বিচারে তাঁর এক বছর এগার মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং এক হাজার টাকার জরিমানা ধার্য হলো। কিন্তু অত্যাচার ও নিপীড়ন সত্ত্বেও 'যুগান্তরে'-এর প্রকাশ বন্ধ হলো না।

'যুগান্তর' -এর পুনঃপ্রকাশ এবং তা বন্ধ করার জন্য সরকারি দমননীতি সমানভাবে চলতে লাগল। ১৯০৭ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯০৮ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত 'যুগান্তরে'র বিরুদ্ধে একের পর এক পাঁচটি মামলা রুজু করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি মামলায় একই অভিযোগ, রাজদ্রোহ। প্রত্যেকটি মামলায় যুগান্তরের কোন না কোন পরিচালক দণ্ডিত হলেন। তাতেও যুগান্তরের কোমর ভাঙা গেল না। তখন আরম্ভ হল সম্পত্তি হরণ। পুলিশ যে কোন ছুতোয় যুগান্তরের কার্যালয় এবং ছাপাখানায় হানা দিয়ে সব টাইপ, ব্লক, তৈরি, ফর্মা, ছাপা কাগজের বান্ডিল, প্রয়োজনীয় খাতাপত্র, মায় ডাক টিকিট পর্যন্ত তুলে নিয়ে যেত। অবশেষে এই অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করে সাম্রাজ্যবাদী সরকার 'যুগান্তর'কে কাবু করতে সফল হল।

যিশুর জন্মদিন এবং কিছু কথা

ড. প্রসেনজিৎ নায়েক, (অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ)

বহুদিন যাবৎ খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মানুষ ২৫শে ডিসেম্বর প্রভু যিশুর জন্মদিন পালন করেন। কিন্তু চতুর্থ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিষ্টানদের সকলেই ৬ই জানুয়ারি যিশুর জন্মদিন মানতেন। এখনও খ্রিষ্টানদের একাংশ, অ্যাপোস্টলিক অর্থোডক্স আর্মেনিয়নরা ৬ জানুয়ারিতেই যিশুর জন্মদিন পালন করেন। আগে ইহুদিরা প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর সূর্যের জন্মদিন পালন করতেন। এখন সূক্ষ বিচারে উত্তর গোলার্ধে ২২ ডিসেম্বর হচ্ছে সবচেয়ে ছোট দিন। ২৩ ডিসেম্বর থেকে দিন বাড়তে থাকে এবং ২১ মার্চ দিন ও রাত সমান হয়। দিন সবচেয়ে বড় হয় ২১ জুন। উল্লেখ্য, মানুষ বা কোনও প্রাণী যেদিন জন্মায় সেদিন সে সবচেয়ে ছোট থাকে। ঠিক ২২ ডিসেম্বর দিন সবচেয়ে ছোট থাকে। তাই আধুনিক গণনায় ২২ ডিসেম্বর সূর্যের জন্মদিন। কিন্তু প্রাচীনকালে সূক্ষ গণনার অভাবে ২৫ শে ডিসেম্বর সূর্যের জন্মদিন ধরে তার জন্মদিন পালন করা হত।

যিশু জন্মসূত্রে ছিলেন ইহুদি। ইহুদিদের অন্যতম দেবতা ছিলেন সূর্য। ইহুদের একাংশ খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ইহুদিদের সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে খ্রিষ্টধর্মে। তাই সূর্যের জন্মদিন এবং যিশুর জন্মদিন একাকার হয়ে যায়। যিশু কেন্দ্রিক বড়দিন হয়ে ওঠে ২৫ শে ডিসেম্বর। ইংরেজি শব্দ 'ক্রস' বলতে একটি সরলরেখার উপর আড়াআড়িভাবে আর একটি সরলরেখা টেনে আঁকা চিহ্নকে বোঝায়। আবার যে বধদন্ডে যিশুর প্রাণসংহার করা হয়েছিল, তাকেও ক্রস বলা হয়। বধদন্ডের আকৃতিও (+) ক্রসের মতো ছিল। ক্রসে প্রাণসংহার হওয়ার কারণে যিশুর নামের সঙ্গে ক্রসের অনুকরণে ক্রাইস্ট যোগ হয়ে যিশু হয়ে যান জিসাস ক্রাইস্ট বা যিশুখ্রিষ্ট।

আমরা জানি, মাস্টার শব্দের অর্থ প্রভু। আবার অভিধান অনুযায়ী দ্য মাস্টার শব্দের অর্থ যিশুখ্রিষ্ট। ক্রাইস্ট মাস্টার কথার সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ক্রিসমাস যার অর্থ খ্রিস্টপ্রভু বা প্রভুখ্রিস্ট।

ক্রিসমাস বার্থডের সংক্ষিপ্ত রূপ হয়ে ক্রিসমাস ডে বা ক্রিসমাস। তাই ক্রিসমাসের বিশেষ অর্থ যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন বা খ্রিস্টজন্মোৎসব। উত্তর ভারতে বড় পুজো বা উৎসবের দিনকে হিন্দিতে 'বড়দিন' বলে। এই সূত্রে ক্রিসমাসকে 'বড়দিন' এবং বাংলায় 'বড়দিন' বলা হয়। বলাবাহুল্য, বড়দিনে ভারতসহ প্রায় সারা বিশ্ব আনন্দে মেতে ওঠে।

তথ্যসূত্র (Sources)

১। Taylor, Joan E. (1993) : The Myth of Jewish - Christian Origins.

২। Paul L. Maier : "The Date of the Nativity and Chronology of Jesus and Virgin Mary".

৩। Helmut Koster : "Ancient Christian gospels : their history and development".

৪। Ulrich luz, : The Theology of the Gospel of Matthew, Cambridge University Press.

Uplifting of Dalit And Dr. Ambedkar

Sanjib Dolai, (Prof. Dept. of English.)

Dalit the term is a self - applied concept for those called the "untouchables" and others that were outside of the traditional Hindu - Caste hierarchy.

Dr. B.R. Ambedkar was of the opinion that only political empowerment would resolve the problem of social justic. Due to his examplary efforts, Dalits began organising themselves, demanding reserved seats in educational institutions and seperates electorate that would choose the Dalit members for legislative Council. In 1930, Ambedkar entered national politics and founded the Depressed Classes Association. He was nominated as the delegate of the oppressed classes for the second Round Table conference. There he clashed with Mahatma Gandhi by demanding seperate electorate for Dalits. He demanded a seperate electorate for Dalits and to give them political power, he signed the Poona Pact. The Poona pact gave the depressed classes reserved seats in provincial and central Legislative Councils.

"I measure the progress of a community by the degree of progress which woman has achieved" — These were the words of Dr. Bhimrao Ambedkar as he addressed a gathering in 1927, when we worked about feminist icons in India. We often tend to over look Dr. Ambedkar. While Babasaheb's work is most often cited as example while opposing and fighting the caste system and Caste bias. We often fail to recognise the other aspects of his work. Apart from the numerous speeches while highlights his basic belief in the equality of woman. Ambedkar's theorisation of the interlinked nature of caste and gender bases oppression in India was a pioneering feat.

In his 1917 paper titled "Castes Indian context' there are specific ways in which women and their sexuality are controlled. He outlines this by showing how strict control of women through sati, child marriage, and restriction of widow remarriage were all devised to deal with the problematic idea of "Surplus Women" Dr. Ambedkar wanted women to have greater participation in all walks of Life, especially in the political arena. Ambedkar was also the one to introduce the Hindu code Bill to facilities the legal recognition of women as equal citizens in the country. The Bill granted women the right to Divorce, and the right to in heritance and provided for legal - recognition of inter caste marriages. Dr. Ambedkar also recognised the Equal Remuneration Act of 1976 and Dowry prohibition Act of 1961. His Contribution to the feminist movement in India thus cannot be sidelined or forgotten.

"We are Indian,
firstly and Lastly"
.... Dr. Ambedkar

মানসিক চাপ ও তার সমাধান

পামেলী মন্ডল, (অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অসন্তোষরূপে একটি বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে এবং তার রাজ্য বিস্তার করে চলেছে। এটি মানসিক চাপ। মানসিক চাপ হল দেহ ও মনের এক প্রকার উত্তেজনা যার থেকে কোন নিষ্কৃতি নেই। একটি গাড়িতে একসেলেটর চালু করে নিউট্রাল গিয়ারে রেখে ভেতর থেকে যদি সচেষ্ট হওয়ার শুরু করে, ঠিক সেরূপ মানসিক চাপ একপ্রকার তাই। এজন্য আমাদের মানসিক সুস্থতার হার ধীরে ধীরে কমছে। এজন্য সমাজ মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালনে ব্রতী হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১০ ই অক্টোবরকে সেই দিন হিসেবে গ্রাহ্য করেছেন।

মানসিক চাপ সৃষ্টি হলে কী হয়?

মানসিক চাপ দেহ ও মনের সাথে সম্পৃক্ত। এটি মন থেকে তৈরি হয় যা দেহকে প্রভাব দেয় এবং পুনরায় দেহ মনের ওপর চাপ তৈরি করে— তা থেকে উদ্ধারের জন্য, এইভাবে এক চক্রের সৃষ্টি হয়। এই চক্র সময়ে ভঙ্গ নাহলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয় ওঠে।

মানসিক চাপে মানুষ দুটি পথ অনুসরণ করে—

১. মানসিক বিকলতা — শারীরিক অবস্থার অবনতি

২. মানসিক চাপ অভিযোজন — উচ্চ ফলাফল

ভারতীয় সংস্কৃতি ও মানসিক চাপ ঃ

ভারতবর্ষের সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা। বৈদিক সভ্যতা ও শিক্ষানুসারে প্রতিটি মানুষ সু-সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। কয়েকদশক আগে পর্যন্ত পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা, গুরু বা শিক্ষক সঙ্গে শিষ্য বা ছাত্রের সম্পর্ক ছিল অতি নিবিড়। প্রতিবেশীরাও ছিল নিকট আত্মীয় পরিজনের মতো কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পশ্চিমী দেশগুলোর সংস্কৃতি ভারতে এমন ভাবে ছড়িয়ে গিয়েছে যেগুলো গ্রাস করে নিচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির আবেগ, ভালোবাসা, দয়া, করুণা, ক্ষমা। যার জন্য ঘটছে আত্মহত্যা, সম্পর্কে মূল্যবোধের ভাঙন, অর্থনৈতিক বৈসাদৃশ্য, ডিভোর্স।

ভারতের সুসমৃদ্ধ বৈদিক সংস্কৃতি আমাদের পথ দেখায় যে, 'সর্বে সুখিন ভবন্তু'— ভগবানের সৃষ্ট সকল সন্তান গাভী, কুকুর, পাখি, কীট সব জীবেরা সুখী হোক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রগতির নামে বর্তমানে ভারতীয়রা ভিত্তিবিহীন সংস্কৃতির দাসত্ব বরণ করেছেন। যা বেদজ্ঞানহীন ভারতীয়দের জন্য ক্রমবর্ধমান সমস্যা।

মানসিক চাপ সমস্যা ও সমাধান ঃ

এর থেকে মুক্তি পেতে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির মতো জীবন শৈলী গঠন করা উচিত।

১. দৈহিক প্রয়োজন— খাবার, ব্যায়াম, বিশ্রাম

২. সামাজিক প্রয়োজন— কাউকে ভালোবাসা দেওয়া বা পাওয়া

৩. বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও সমৃদ্ধি

৪. আধ্যাত্মিক প্রয়োজন— জীবনের লক্ষ্য এর উপলব্ধি করা

প্রতিটি প্রয়োজন বাস্তব এবং গভীর। প্রতিটি প্রয়োজন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। আমরা বীজ বপন করব এক আর ফলের আশা করব আর এক- তখনই সমস্যা তৈরি হবে। এজন্য আমাদের মৌলিক প্রয়োজনগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, আমাদের এই চেতনা রূপান্তরের জন্য বেদের ৭টি স্বর্ণসূত্র রয়েছে।

১. বর্তমানে বাস করুন।

২. অতীতের জন্য অনুশোচনা নয়।

৩. ভবিষ্যতের দিবাস্বপ্নে নিমজ্জিত হবেন না।

৪. জাগতিক জীবন আপেক্ষিক, কোন কিছুই দীর্ঘসময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৫. জীবন একটি ভ্রমণের মতো।

৬. মিথ্যা অহংকার বর্জন করুন।

৭. অন্যকে মুগ্ধ করার জন্য নিজে চাপ নেওয়া উচিত নয়।

উক্ত নিয়মগুলো মেনে সরলভাবে নীতি অনুসরণের চেষ্টা করব যখন, তখন মানসিক চাপ মুক্ত হয়ে সুখী ও দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হব।

কারো যদি কাজ করবার কিছুমাত্র ইচ্ছা থাকে তাহলে ঈশ্বর তাকে ঠিক সেই পথেরই সন্ধান দেন।

— মাদার টেরিজা

যোগঃ মহাশ্বেতা ও পার্বতী

অর্পিতা চক্রবর্তী, (অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ)

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যোগ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়। মহর্ষি পতঞ্জলী তাঁর 'যোগসূত্র' নামক গ্রন্থে 'যোগ' শব্দটির অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন— 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'— অর্থাৎ 'যোগ' হল চিত্তের বৃত্তি গুলির নিরোধ বা বারণ। যোগশাস্ত্র মতে মনের মাধ্যমে চিত্ত যখন কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন চিত্ত সেই বিষয়ের আকার গ্রহণ করে। চিত্তের এই বিষয়াকার গ্রহণই চিত্তের বৃত্তি। পতঞ্জলী বলেন যোগ সাধনার দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং আত্মপোলব্ধি রূপ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।

যোগাভ্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য, যোগ দর্শন অনুসারে— আত্মসচেতনতা। এই দর্শন বলে যে যোগব্যায়াম-প্রাণায়াম প্রভৃতি আমাদের শৃঙ্খলিত করে- যা হল যোগের বহিরঙ্গ সাধন, অন্যদিকে ধারণ, ধ্যান ও সমাধি-যোগের অন্তরঙ্গ সাধন- যা চুড়ান্ত ক্লেশের মধ্য দিয়ে স্বরূপ উপলব্ধি ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সাধককে পৌঁছে দেয়।

ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গিকতা আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করি। কবি বানভট্টের লেখা কথা জাতীয় গদ্যকাব্য হল 'কাদম্বরী'। 'কাদম্বরী' একটি সুপরিচিত সংস্কৃত কাহিনী। যেখানে চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর প্রেমের পাশাপাশি পুন্ডরীক ও মহাশ্বেতার প্রণয়বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। আমরা যদি মহাশ্বেতা চরিত্রটির দিকে আলোকপাত করি তাহলে দেখতে পাবো প্রেম, ভক্তি ও সাধনার দ্বারা মহাশ্বেতা যেন এক স্বর্গীয় মনন ও স্বর্গীয় শরীরে উন্নীত হয়েছে। সাধনার দ্বারা সে তার প্রার্থিত প্রেম ফিরে পাচ্ছে। পুন্ডরীকের সাথে পুনর্মিলনের আকাঙ্খায় মহাশ্বেতাকে আমরা দেখতে পাই সমস্ত লৌকিক অবলম্বন ত্যাগ করে সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভের দিকে অগ্রসর হয়েছে। মহাশ্বেতার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন শুদ্ধতা, শুচিতা, তপঃ, ঈশ্বর একাত্মতা ও ধ্যান সবগুলিই যোগের এক একটি অঙ্গস্বরূপ। চন্দ্রাপীড় অচ্ছোদ সরোবরের গভীর অরণ্যে যখন প্রথম মহাশ্বেতাকে দেখেন তখন তাকে বীনাবাদনরতা যোগিনী বলে উল্লেখ করেছে। বানভট্টের বর্ণনায় আমরা মহাশ্বেতার একাগ্রভূমিক চিত্তস্তর লক্ষ্য করি যা যোগসাধনার বিশেষ অনুকূল চিত্তস্তর। এই তথ্য আমরা পতঞ্জলীর যোগসূত্র পাঠ করলেই জানতে পারি। 'কাদম্বরী' কাব্যে বানভট্ট আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রেম এবং ভক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। যোগ দর্শন ত্যাগের মাহাত্ম্যের উপর জোর দেয়।

মহাকবি কালিদাসের লেখা মহাকাব্য 'কুমারসম্ভবম্' কাব্যের নায়িকা পার্বতী চরিত্রটিতেও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আমরা সাধনার (যোগ) প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করি। কাহিনীতে আমরা দেখি হিমালয়দুহিতা পার্বতী সিদ্ধযোগী মহেশ্বরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। সমস্ত প্রকার লৌকিক চাতুরি যেমন মদনের সাহায্য নিয়ে শিবকে কামাসক্ত করার নিমিত্ত পঞ্চশর নিক্ষেপ প্রভৃতি ব্যর্থ হয়। কিশোরি সুলভা চঞ্চলা পার্বতী ক্রমে সাধিকা পার্বতী হয় ওঠেন এবং তপঃ অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান— এই তপঃ বা তপস্যা যোগের অষ্ট যোগাঙ্গের একটি অঙ্গ। যোগ মতে তপঃ বা তপস্যা হল ব্রতাচার অনুশীলন ও সহনশীলতা অভ্যাস। সংকল্পসাধনে কষ্টসহন অভ্যাসই তপঃ বা তপস্যা। স্বল্পাহার, কখনো উপবাস, কোমল-শয্যা বর্জনপূর্বক কঠিন শয্যা গ্রহণ শীত-উষ্ণ সহন ইত্যাদি তপস্যার অন্তর্গত। অভীষ্টলাভে পার্বতী চরম কৃচ্ছসাধন করেছেন এবং তপস্যাকালীন সময়ে

একটি পর্ণ বা পাতাও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি তাই তিনি অপর্ণা নামে সুপরিচিত হন। সাধকের যে সময় ক্ষুধাবোধ, বাহ্যজ্ঞান প্রভৃতি দূরীভূত হয় তখন সাধক যোগের চরম অবস্থায় উন্নীত হয়। এই স্তরে সাধকের চিত্ত হয় নিরুদ্ধ এবং এই নিরুদ্ধ চিত্তস্তর সমাধির অনুকূল। সমাধিতে সাধকের সিদ্ধিলাভ হয়। মহাকবি কালিদাস পার্বতীর যে কঠোর তপস্যার বর্ণনা দিয়েছেন তা আমাদের সমাধি যোগের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অন্তে আমরা দেখি পার্বতী ও মহেশ্বররের মিলনে কুমার কার্তিকেয় জন্ম নেন।

গ্রন্থঋণ —
যোগসূত্র — পতঞ্জলী
কাদম্বরী — বানভট্ট
কুমারসম্ভবম্ — কালিদাস

সংকট থেকে সংকটোত্তরণ ঃ প্রেক্ষিত সুবোধ ঘোষের গল্প

নমিতা মাইতি, (অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ)

মূল্যবোধ প্রত্যেক মানুষের অন্তর্নিহিত চেতনা নির্ভর। জীবনের মূল্য সীমাকে অন্বেষণ করতে মানুষ যে বিশ্বাস ও মানবিক আদর্শের প্রতি আস্থা রাখে তাই তাদের মূল্যচেতনা। মূল্যবোধ মানুষের একটি বড় সম্পদ, মূল্যবোধে ভাঙন দেখা দিলে সমাজ ক্রমশ ধ্বংসের পথে এগোবে। পরিবর্তনশীলতা, নৈতিকতা, সামাজিক নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, নাগরিক জাগ্রত চেতনা, আইন কানুন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি হল মূল্যবোধের মূল বৈশিষ্ট্য।

মানুষ নিজের প্রয়োজনেই সমাজ সৃষ্টি করেছে, প্রথমে তার ব্যক্তিসত্তা, তারপর সেই ব্যক্তিকে ঘিরে গড়ে ওঠে পরিবার; কয়েকটি পরিবারের সমষ্টিই হল সমাজ। সমাজকে রক্ষা করার জন্য মানুষ কতকগুলি নিয়ম সৃষ্টি করেছে, সমাজকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখতে এবং আধুনিককালে মানুষের মধ্যেই তা প্রকাশ পেয়েছিল, ক্রমশ মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, যুক্তি, বিচারের দ্বারা সভ্যতা যত অগ্রসর হল আদিম মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত মূল্যবোধগুলি অপ্রকাশিত ছিল ক্রমশ তার প্রকাশ হল। মানুষের মধ্যে যে আদিম প্রবৃত্তি আছে তাকে জয় করাই তার মূল্যবোধ।

সাহিত্য হল জীবন অভিজ্ঞতার সার্থক প্রতিফলন। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে সুবোধ ঘোষ সাহিত্যে আবির্ভাব লগ্নেই বিস্ময়কর সাফল্য এনে দিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে জীবনের অজস্র অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ ভান্ডার থেকে তিনি কিছুটা বিতরণ করেছেন। তাঁর প্রতিটি ছোটগল্পের মধ্যেই নতুনত্ব পরিলক্ষিত হয়। সুবোধ ঘোষের যে সমস্ত গল্পে সমাজ এবং ব্যক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মূল্যচেতনা প্রকাশিত হয়েছে সেই গল্পগুলির নিরিখে আমরা তাঁর গল্পগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি। যেমন—

১। ব্যক্তির মূল্যবোধের উত্তরণ,

২। ব্যক্তির মূল্যবোধের উদ্ভাসন,

৩। ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকট।

চল্লিশের দশকে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রধান হয়ে উঠল রাজনীতিচর্চা, বিশ্ব মহাসমর এবং তার আনুষঙ্গিকের ধাক্কায় দ্রুত সংগঠিত হচ্ছিল সমাজের ভাঙন, ফলে মনোরাজ্যেও দেখা দিল আদর্শ সংঘাত। সুবোধ ঘোষের গল্পের মধ্যে আছে তারই সার্থক রূপায়ন। তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে মধ্যবিত্তের শঠতা, বঞ্চনা, নীচতা, ভীরুতা, সুবিধাবাদ, আত্মপ্রবঞ্চনা, ঘৃণ্য আপোসকামিতা জাতীয় ক্ষতিকারক দোষসমূহ চিত্রিত করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বে, সময় ও সমাজে যে অভিঘাত তৈরি হল, আত্মসংকটের হাহাকারময় আবর্তে নিক্ষিপ্ত হল মধ্যবিত্তের পর্যদুস্ত মূল্যবোধ, সহজ সরল মানসিকতা হল জটিল থেকে জটিলতর। সুবোধ ঘোষের গল্পে তারই প্রতিফলন।

অযান্ত্রিক ঃ—

শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শ্রমই একমাত্র মূলধন জীবনধারণের। এই শ্রম যে বাড়তি খাদ্য উৎপাদনে বা বস্তুনির্মানে সক্ষম হয়, সেই লাভ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একাংশ মানুষ ভোগ করে বলেই যত বিরোধ। আবার শ্রমদানের ক্ষমতা যখন শ্রমিকদের চলে যায়, তখন জীবনধারণের উপযোগী আশ্রয়ের অসহায়তা তাদের পঙ্গু করে দেয়। 'অযান্ত্রিক' গল্পের কাহিনীও তাই। গল্পের নায়ক বিমলের পুরানো আমলের এবং প্রায় জীর্ন হওয়ার মতো অবস্থা গাড়িটি হল 'জগদ্দল'। এটি বিমলের জীবনের পক্ষে বড় প্রিয় সম্পদ। গাড়িটি পুরানো হয়ে যাওয়ার ফলে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি তার দেখা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিমল অতি সস্নেহে তার এমন গাড়িকে নিজের হাতেই সারায়। কিন্তু

ক্রমশ বিমল অনুভব করে, তার যেমন বয়স হয়েছে, তেমনি বয়স হয়েছে জগদ্দলের। গতি কমে আসছে, যেন মানুষের মতোই বার্ধক্যের রোগে ধরেছে তাকে। বিমল কিন্তু দমবার পাত্র নয়। যে জগদ্দলকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

কিন্তু এখন তার এই অক্ষমতায় বিমল তার হাতঘড়ি, বাসনপত্র এমনকি শোবার তক্তপোষটাও বিক্রি করে তাকে একেক করে নতুন করে দেয়। খুশি হয়ে সেদিন বিমল রাতে ঘুমাতে গেলেও গভীর রাতে ঝুপঝুপ বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভাঙে, গ্যারাজে গিয়ে দেখে ফুটো টিনের ছাদ দিয়ে জল পড়ে ইঞ্জিন অকেজো হবার উপক্রম। নিজের শোয়ার বিছানার সবকিছু দিয়ে ঢেকে গাড়ির মধ্যেই ঘুমোয় বিমল।

এত করেও যেন বা ভাগ্যের ফেরে জগদ্দল পরের দিন সকালে রাস্তায় বেরিয়েও বিকল হয়ে যায়। যেন নিয়তির টান এসেছে জগদ্দলের। বিমলের মনে শূন্যতার ছায়া নেমে আসে। বোঝে জগদ্দলকে এবার বিদায় দিতেই হবে। আর যখন তার এই উপলব্ধি, তখন সেও সমস্ত দিক থেকে নিঃস্ব অসহায়।

ফসিলঃ—

গল্পটি প্রকাশ হওয়া মাত্রই খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। রাজ্যগুলিতে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজারা কী ধরণের প্রজাপীড়ন করতেন তার ইঙ্গিত 'ফসিল' গল্পে কিছুটা আছে। 'ফসিল' তিন শক্তির দ্বন্দ্বে চিহ্নিত। ভারতে শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে দেশি রাজশক্তির ও বিদেশি ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট শক্তির দ্বন্দ্ব ও মিলন দেখানো হয়েছে। 'ফসিল' গল্পের মধ্যে ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকটকে উদ্‌ঘাটিত করে বাংলা সাহিত্য একটি অনালোকিত অধ্যায়কে আলোকিত করে তোলেন— ''অঞ্জনগড় নামে এক নেটিভ স্টেট। সাড়ে আটষট্টি বর্গমাইল এই রাজ্য মূলত ভীলকুর্মী মাহাতোদের . দেশ রাজ দরবারের ল- এজেন্ট নিয়োগ করা হয় মি. মুখার্জি কে। যিনি মধ্যযুগীয় বর্বরতার প্রেক্ষাপটে উপদেষ্টা হয়ে এলেন। মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিমান, আদর্শ সচেতন, ডেমোক্রেসির স্বপ্নদর্শী। সেই-ই স্বপ্ন দেখাবে যে- রাজ্যশাসন একটা আর্ট, লাঠিবাজি নয়।''

একদিকে খাল কাটাকে কেন্দ্র করে মুখার্জির সঙ্গে কোম্পানীর সংঘাত ঘনিয়ে ওঠে। অন্যদিকে দুলাল মাহাতো মজুরদের অধিকার মজুরদেরই বুঝে নেওয়ার পরামর্শ দেন।

এই সংকটময় পরিস্থিতিতে খনিতে ঘটে যায় দুর্ঘটনা, ধস নামে চাপা পড়ে যান প্রায় ১০০ শ্রমিক। ওই একই দিনে অনেক প্রজা বিনা পারমিটে লকড়ি কাটতে উদ্ধত হয়েছিলেন। পাহারাদারদের সঙ্গে শুরু হয় সংঘর্ষ। ফরেস্ট গার্ডদের গুলিতে মৃত্যু হয় বাইশ জনের।

এই মুহূর্তে মুখার্জির পরামর্শ চাই। মুখার্জি পরামর্শ দিলেন দুলাল মাহাতোকে আটক করা ছাড়া উপায় নেই। সে ছাড়া থাকলে রাজ্যটা ছারখার হয়ে যাবে। খনির গিবসন সাহেব রেজিস্টার গায়েব করে দিতে উদ্যত হলেন। ও দিকে প্রজারা ছুটছেন ধসের দিকে। ইতিমধ্যে ঘোড়ানিমের বাইশটা লাশ এবং দুলাল মাহাতোর লাশ খনি গর্ভে চালান হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তে, অতি তৎপরতার সঙ্গে। প্রমাণ কিছুই থাকল না।

এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে অন্ধকারে একফালি রোদ্দুরের মতো সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে— প্রগতিশীল মানসিকতা সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত মানুষের 'নিমকের দাম' দিতে গিয়ে ঢের মাশুল দিতে হয়, কারণ একটা বিপুল সম্ভাবনাময় লড়াইকে মাঠে মেরে ফেলেছে মুখার্জির মধ্যবিত্ত মানস। প্রজাদের রক্তাক্ত কাহিনী কোনদিনই আলোর মুখ দেখবে না। অসহায় ভাবে মি. মুখার্জিও তা অনুধাবন করেন একসময়— ''এই পৃথিবীর কোনো এক জাদুঘরে

জ্ঞান বৃদ্ধ প্রত্ন-তাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে কতকগুলি ফসিল দেখবে।" একদল ''অপরিণত মস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাবহিউম্যান শ্রেণির পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল----- যারা আকস্মিক কোনও ভূ-বিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রানিটের স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল, তারা দেখছে, শুধু কতকগুলি সাদা ফসিল। তাতে আজকের এই লাশে রক্তের কোনও দাগ নেই।"

জীবজন্তু 'ফসিল' হয়। ফসিল হতে পারে মানুষও প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ে। কিন্তু মানুষেরই সৃষ্ট মৃত্যুতে আর এক মানবগোষ্ঠী ফসিল হবে আজ থেকে কয়েক লক্ষ বছর পরে— এ তো কল্পনার অতীত! আমরা সভ্যতার অগ্রগতির মধ্যে অনেক এগিয়েছি। আদিম জীবজন্তু থেকে জীবের শরীরেরও বুদ্ধির বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে হয়েছি মানুষ। ফসিলের জন্মের একাধিক স্তর পেরিয়ে। এখন আবার যদি ভবিষ্যতের মানুষ ফসিলের মধ্যে দেখে সভ্য মানুষেরই সাদা, রক্তহীন ফসিল, তাহলে প্রমাণিত হয়ে যায়- মানুষ সভ্য হয়েও সভ্য হয়নি। মানব সমাজের ও মানুষের মনের বিবর্তনে এই ধারণা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক।

অলীকঃ—

অলীক আশ্চর্য এক মানুষের কাহিনী। কখনো চুরি, ছোটোখাটো ছিনতাই এবং চোরা কারবারী জিনিসের বিক্রি করে কমিশন নেওয়া এসব ছিল তার জীবিকা। সে মানুষকে কাঁদিয়ে আড়ালে হাসতে চায়। কোথাও সে ধরা পড়তো না। মাঝে মাঝে ধরা পড়লে পালিয়ে বাঁচতো। একদিন একটি অতি সাধারণ বিয়ে বাড়িতে বিপন্ন কনের বাবার দুঃখ তাকে স্পর্শ করে। কৌশলের দ্বারা সে মেয়েটার বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পণ যৌতুক নিজেই দিতে পারে পাত্রপক্ষকে এই বলে বিয়েতে রাজী করায়। তার মিথ্যে প্রতিশ্রুতিতে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ে বাড়িতে সে তখন ত্রাতার ভূমিকায় উজ্জ্বল, ক্রমশ সে জড়িয়ে পড়ে, মেয়েটির জন্য তার মায়া হয়, তার শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার দৃশ্য দেখবার জন্য সে ওর বাড়ির সামনে যায় ধরা পড়ে মার খায়। তবু বাড়ি ফিরে এসে তার স্ত্রীর কাছে একটি কন্যা সন্তানের কামনা করে।

যে মানুষটির মধ্যে কোনো সুস্থ জীবনবোধ ছিল না, মানুষকে ঠকানোই যার উদ্দেশ্য ছিল তারও পরিবর্তন ঘটে সকলের অগোচরে। তার মধ্যে এক পিতা জেগে ওঠে, পিতৃত্বের অনুভূতি, পিতৃসুলভ স্নেহ বাৎসল্য তার মধ্যেই উৎসারিত হয়। সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তিচেতনা বিকশিত হয় তার মধ্যে। একটি মেয়ের কারণে চোখের আর্তিতে তার— ''ঠান্ডা ও সাদা হৃদপিন্ডটা যেন একটা উত্তাপের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকে।"

এইভাবে অলীকের জীবনে মূল্যবোধের উত্তরণ হয়। নগন্য এক ব্যক্তির মধ্যে সর্বকালীন পিতার স্বরূপ ফুটে ওঠে।

বারবধূঃ—

'বারবধূ' গল্পে বারবধূ লতার বধূতে উত্তরণের কাহিনী চিত্তাকর্ষক। গল্পটিতে নারী মনস্তত্ত্বের নানান দিক তুলে ধরেছেন সুবোধ ঘোষ। বাস্তব পরিবেশে যাদের বারবনিতা বলা হয় অর্থাৎ পতিতা নারী, যারা শরীরের বিনিময়ে অর্থ রোজগার করে, সেই সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ লতা চরিত্রকে তুলে ধরলেন। যাকে নিয়ে প্রসাদ নামক পুরুষটি অবলীলায় উদ্দাম জীবনযাপনে মত্ত হয়ে ওঠে, গল্পের সূচনায় এক অসাধারণ নাটকীয় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। লতা গণিকা হলেও প্রসাদের অনুরোধে সে প্রসাদের আত্মীয় স্বজনের সামনে নিজেকে তার স্ত্রী রূপে পরিচয় দেয়। তার সাজপোশাকেও আসে পরিবর্তন। প্রসাদের সম্মান রক্ষার্থে সহজ সরল স্বাভাবিক কথাবার্তা

আলাপ চারিতা করে লতা। তাই প্রসাদের আত্মীয় মহলে লতার খুব নাম হয়। এদিকে অভিনয় করতে করতে লতার মধ্যে নারীসত্তা জাগরিত হয়। সে নিজেকে ক্রমশ সম্মানীয় ভাবতে শুরু করে। প্রসাদের সঙ্গে তার এক দূরসম্পর্কের বোন আভার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। প্রসাদ আভার সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ হয় ততই লতার প্রতি আকর্ষণ কমতে থাকে। লতা প্রসাদের রক্ষিতা মাত্র তাই মনের মধ্যে যত অধিকার বোধ থাকুক না কেন তা প্রকাশ করতে পানে না লতা। প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভেবেও সে বেদনায় ভেঙে পড়ে। লতা বলে— 'না তুমি ক্ষতি করনি, আভা ঠাকুরঝি আমার এই সর্বনাশটা করে ছাড়লো।'

এইভাবে গল্পে লতার মূল্যবোধের উত্তরণ ঘটে যায়। প্রসাদের স্ত্রী ভাবে সে নিজেকে। বারবধূ লতা প্রেমের মূল্যবোধে উত্তীর্ণ হয়। প্রসাদের পরিবর্তে সে আভাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। কেবলমাত্র অর্থের বিনিময়ে কাজ করতে আসা মেয়েটি যাওয়ার সময় যেন স্বজন হারানোর দুঃখে কাতর হয়ে ব্যক্তিসত্তার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। বারবধূর খোলস ত্যাগ করে সংসারী বধূর সাজে অধিষ্ঠিত হয়েছে লতা।

একজন মানুষের সত্যিকার জীবন ততক্ষন পর্যন্ত শুরু হয় না, যতক্ষন না সে শুধুমাত্র নিজের স্বার্থের জন্য বাঁচা বন্ধ করে অন্যদের জন্য বাঁচা শুরু করে।

— মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র

(আফ্রিকান আমেরিকানদের স্বাধিকার আদায়ের নেতা)

অবসাদ ঃ এক মানসিক ব্যাধি

ড. শ্যামশ্রী সুর, বিভাগীয় প্রধান শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

মানসিক অবসাদ একপ্রকার মানসিক রোগ। মানসিক অবসাদের ব্যাপ্তি অতি বিস্তারিত এবং চিকিৎসা না করে ফেলে রাখলে মানসিক অবসাদের শেষ হয় আত্মহত্যা দিয়ে। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। তার থেকেও বেশি সত্যি এটাই যে, এই ব্যাপারটা নিয়ে সাধারণ মানুষ তো বটেই, চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের অজ্ঞতাও সীমাহীন। আমরা আমাদের শারীরিক রোগব্যাধি নিয়ে যতটা সচেতন, মানসিক রোগ সম্পর্কে ততটাই উদাসীন। অথচ, মানসিক অবসাদের রোগীরা উচ্চ রক্তচাপ, হাই ব্লাড সুগার, হার্টের অসুখ বা আর্থরাইটিস রোগীদের তুলনায় অনেক বেশী কষ্ট পান। মজার কথা, সাধারণ মানুষের ধারণা, মানসিক অবসাদ কোনো সত্যিকারের অসুখ নয়, এ হল রোগীর ইচ্ছাকৃত কষ্টের অনুভূতি। তাঁরা মনে করেন, এই কষ্ট— অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ কৃত্রিম, কোনোমতেই অসুখ হতে পারে না কারণ অকারণ দুঃখকে কিছুতেই অসুখ বলা যায় না। মনে রাখা উচিত, যাঁরা আত্মহত্যা করেন, তাঁদের বেশিরভাগই মানসিক অবসাদে ভুগে থাকেন। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই মৃত্যুর প্রথম দশটি কারণের মধ্যে আত্মহত্যা অন্যতম। অধিকাংশ যুবসম্প্রদায়ে মৃত্যুর প্রথম দুটি কারণের মধ্যে আত্মহত্যা একটি। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা অনুযায়ী অবসাদ পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্ষতিকারক অসুখ, প্রথমটি হলো হার্টের অসুখ। মানসিক অবসাদের চিকিৎসা কিন্তু এমন কিছু দুর্লভ বিষয় নয়। যে কোন সাধারণ চিকিৎসক এই রোগের চিকিৎসা করতে পারেন। এমনকি ভারতের যে কোন প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও মানসিক অবসাদের চিকিৎসা সম্ভব। গোটা ভারতে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের সংখ্যাও খুব কম নয় আর এই রোগের চিকিৎসার প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক মানের ঔষধও এখন ভারতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে জিনিসটার অভাব চোখে পড়ার মত, তা হলো এই রোগ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা, তার সাথে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দুটি জিনিস থাকলেই বহু মূল্যবান প্রাণ আত্মহত্যা করা থেকে রক্ষা করা যেতো। প্রতি একশো পুরুষের মধ্যে দশজন পুরুষ এবং প্রতি একশো নারীর মধ্যে কুড়িজন নারী মানসিক অবসাদে ভুগছেন। একাকীত্বর দরুণ ষাট বছর বয়সী বয়স্ক মানুষেরা এই রোগে ভুগছেন। পিছিয়ে নেই শিশুরাও। শিশুদের মধ্যে মানসিক অবসাদ ক্রমশঃ প্রকট হচ্ছে। এই রোগ সম্পর্কে এখনি সচেতন না হলে ভবিষ্যৎ আশঙ্কাজনক হয়ে উঠবে। মানসিক অবসাদ বা বিষন্নতা ইংরেজিতে ডিপ্রেসিভ ইলনেস নামে পরিচিত। এই রোগে মৃত্যু না হলেও মানুষের কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় বা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। মানসিক অবসাদে সারা পৃথিবীতে মানুষের কাজের পরিমানগত ও গুনগত মান সবচেয়ে বেশি নষ্ট হয়। এই অবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ চলতে থাকলে অবসাদে ভোগা মানুষটি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাকে বেছে নেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী এই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রথম চারটি কঠিনতম অসুখের মধ্যে চতুর্থতম অসুখটি হল ডিপ্রেসন। শুধু তাই নয়, ডিপ্রেসন এর জন্য হার্টের অসুখ ও মেটাবলিক ডিজঅর্ডার- জাতীয় অসুখ, হাই কোলেস্টেরল লেভেল, হাই ব্লাডসুগার এবং হাই ব্লাডপ্রেসারজনিত অসুখ, করোনারি আর্টারি ডিজিজ এবং হার্টের অসুখ ভীষণভাবে বেড়ে যায়। শরীরের কোন অঙ্গ মানসিক অবসাদের জন্য দায়ী তা সঠিকভাবে নির্ণীত না হলেও এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মস্তিষ্কের কিছু রাসায়নিক পদার্থ আমুল পরিবর্তন ঘটিয়ে এই অসুখ বাড়িয়ে তোলে। মস্তিষ্কে সেরোটোনিন ও নরএপিনেফ্রিন মাত্রাতিরিক্ত কমে যায়। বাজারে যে মানসিক অবসাদের ঔষধগুলি পাওয়া যায়, তা ঐদুটি রাসায়নিক পদার্থের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। ফলস্বরূপ এই ঔষধ সেবনের পর রোগী নিজেকে সুস্থ ও রোগমুক্ত মনে করেন এবং দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে পুনরায় লিপ্ত হতে পারেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড এর মতে, চেতন ও অবচেতন মনের ক্রিয়ার দ্বন্দ্বই মানসিক রোগের মূল কারণ। মস্তিষ্কের কাজের গোলযোগই মানসিক রোগের কারণ। আবার এটাও ঠিক যে, মস্তিষ্কের রাসায়নিক পদার্থের পরিবর্তন মানবমনের গতিপ্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল।

পরিসংখ্যান বলছে, এই মুহূর্তে পৃথিবীর অন্ততঃ আশি কোটি মানুষ মানসিক অসুখে ভুগছেন যার মধ্যে অধিকাংশই ডিপ্রেশনের শিকার। বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই বা স্বাভাবিক কারণে অথবা বিশেষ কোন দুশ্চিন্তা বা ভয় থেকে সৃষ্ট দীর্ঘস্থায়ী বিষাদকে কেন্দ্র করে যে মানসিক অসুখের উদ্ভব হয়, তাকে বলা হয় মানসিক অবসাদ বা ডিপ্রেসিভ ইলনেস। এবার মানসিক অবসাদের কিছু লক্ষণ আলোচনা করা যাক। * অকারণ দুঃখের ভাব, কিছু ভালো না লাগা, হীনমন্যতা, মনের আনন্দস্ফূর্তি লোপ পাওয়া, সবসময় মনমরা ভাব। *খিটখিটে মেজাজ পরিবারের সদস্য, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধবদের সাথে গল্প/ আড্ডায় অনাগ্রহ * বিনোদন থেকে খেলাধূলা কিছুতেই মনোযোগ থাকে না। সদা বিষাদময় ভাব। * নৈরাশ্য, উদাসীনতা, আত্মবিশ্বাস এর অভাব। * খিদে হ্রাস, দুর্বল শরীর, ওজন হ্রাস। *দিনের অধিকাংশ সময় বিছানায় কাটানো। * যৌন ক্ষমতা / যৌন ইচ্ছা হ্রাসপ্রাপ্তি। * রোগী নিজেকে কঠিন রোগাক্রান্ত (ক্যানসার, টিবি, এইডস) মনে করে। * ক্লান্তি ও আলস্যতা, মনসংযোগ অক্ষমতা। মানসিক অবসাদ অনুভব করলে কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়। আপনার জন্য যা কিছু ভালো তা খুঁজে বের করুন এবং নিজের জন্য সর্বোত্তম পন্থাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।

কারও সাথে কথা বলুন ঃ কোনও দুঃসংবাদ শুনলে বা শোকের সময় কষ্ট চেপে রাখার চেষ্টা করবেন না। কাছের কোনও মানুষের সাথে আপনার অনুভূতির ব্যাপারে কথা বলা সহায়ক হতে পারে। আপনি যদি মনে করেন যে কারও সাথে কথা বলতে পারবেন না, তাহলে আপনার অনুভূতিগুলো কোথাও লিখে রাখতে পারেন।

সক্রিয় থাকুন ঃ সম্ভব হলে ব্যায়াম করার জন্য ঘরের বাইরে যান, এমনকি কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি জন্য করুন। এটি আপনাকে শারীরিকভাবে সুস্থ রাখবে এবং আপনার ঘুম ভালো হবে। অন্যান্য কাজকর্মে মনোযোগ দেওয়া এবং দুশ্চিন্তা ও খারাপ অনুভূতিতে মন না দেওয়া সহায়ক হতে পারে।

সঠিকভাবে খান ঃ ক্ষুধা না পেলেও নিয়মিত খাওয়ার চেষ্টা করবেন। মন বিষন্ন থাকলে সহজেই আপনার ওজন কমে যায় এবং ভিটামিনের অভাব দেখা দেয় অথবা অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুড খাওয়া হয় এবং অযাচিতভাবে ওজন বেড়ে যায়। সুষম খাদ্যাভ্যাস, বেশি বেশি ফল ও সবজি খাওয়া আপনার শরীর ও মন সুস্থ রাখতে পারে।

অ্যালকোহল ও মাদক পরিহার করুন ঃ অ্যালকোহল আপনার মন অল্প সময়ের জন্য ভালো রাখতে পারে, তবে এটা দীর্ঘ মেয়াদে আপনাকে আরও বেশি মানসিক অবসাদগ্রস্ত করে ফেলবে। একই কথা যেখানে-সেখানে বিক্রি হওয়া মাদকের জন্যেও প্রযোজ্য যেমন ক্যানাবিস, অ্যামফেটামিন, কোকেন এবং এক্সট্যাসি।

ঘুমের রুটিন তৈরি করুন ঃ প্রতি রাতে একই সময়ে শুয়ে পড়ুন এবং প্রতি সকালে একই সময়ে জেগে উঠুন। বিছানায় যাওয়ার আগে আরামদায়ক কিছু করুন যা আপনার ভালো লাগে, যেমন প্রশান্তিদায়ক সংগীত শোনা অথবা বই পড়া। ঘুমাতে না পারলে বিছানা থেকে উঠে চুপ করে সোফায় বসে থাকতে পারেন।

প্রশান্তিদায়ক কাজ করুন ঃ আপনি সবসময় চিন্তিত অনুভব করলে প্রশান্তিদায়ক কিছু করুন যেমন যোগ ব্যায়াম, ম্যাসাজ, অ্যারোমাথেরাপি কিংবা এমন কোনও কাজ যা আপনাকে প্রশান্তি এনে দেয়।

নিজেকে আনন্দ দেয় এমন কাজ করুন ঃ নিয়মিত কিছু সময় নিয়ে এমন কাজ করুন যা আপনি উপভোগ করেন, যেমন গেম খেলা, বই পড়া, কিংবা অন্য কোনও শখের কাজ।

মানসিক অবসাদ সম্পর্কে পড়ুন ঃ মানসিক অবসাদ সম্পর্কে অনেক বই ও ওয়েবসাইট আছে। কী ঘটছে বুঝতে, কৌশলগতভাবে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করতে এবং আপনি কীরূপ সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তা বুঝতে এগুলো সাহায্য করতে পারে।

নিজের প্রতি দয়াশীলতা অনুশীলন করুন ঃ আপনি হয়তো একজন নিখুঁত মানুষ যিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করেন। লক্ষ্য বা প্রত্যাশা ঠিক করার ব্যাপারে আরও বাস্তবিক হোন। নিজের প্রতি দয়াশীল হোন।

বিরতি নিন ঃ অল্প কিছু দিনের জন্য নিজের স্বাভাবিক রুটিনের বাইরে যাওয়া আপনার জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে। দৈনন্দিন চাপ ও চিন্তা থেকে নিজেকে একটু বিরতি দিন। চেনা পরিবেশের বাইরে কয়েক ঘন্টা থাকাও আপনার উপকারে আসতে পারে।

একটি সাপোর্ট গ্রুপে যোগ দিন ঃ মানসিক অবসাদগ্রস্ত থাকলে নিজেকে সাহায্য করা কঠিন হতে পারে। একই পরিস্থিতিতে থাকা অন্য মানুষদের সাথে কথা বলা আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারে। কিছু ধারণা পেতে লিফলেটের শেষে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা দেখতে পারেন।

আশাবাদী থাকুন ঃ মনে রাখবেন, অন্য অনেক মানুষও মানসিক অবসাদগ্রস্ত ছিলেন এবং তারা সুস্থ হয়েছেন। আপনার জন্য সাহায্য প্রস্তুত আছে এবং সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য দরকারি সাহায্য আপনার প্রাপ্য। নির্দিষ্ট কোনও মনস্তাত্ত্বিক হস্তক্ষেপের চিকিৎসা গ্রহণের জন্য আপনি যদি অপেক্ষামান তালিকায় থাকেন, তাহলে এ সময়ে নিজের যত্ন নেওয়ার জন্য আপনি কী করতে পারেন তা নিয়ে আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলুন।

কগনিটিভ বিহেভিয়েরাল থেরাপি (সিবিটি) ঃ আমাদের অনেকেরই এমন বিষয় নিয়ে নেতিবাচক চিন্তাভাবনার অভ্যাস রয়েছে যা জীবনে ঘটেনি। এগুলো আমাদেরকে মানসিক অবসাদগ্রস্ত করে তুলতে পারে। সিবিটি যেভাবে সাহায্য করে —

১। আমাদের চিন্তাভাবনার অবাস্তব ও অসহায়ক পথ খুঁজে বের করে।

২। তারপর চিন্তাভাবনা এবং আচরণের নতুন ও উত্তম উপায় বের করে।

৩। মানসিক অবসাদের চিকিৎসা হিসাবে সিবিটি সর্বোত্তম বলে প্রমাণ রয়েছে।

ইন্টারপার্সোনাল থেরাপি (আইপিটি) ঃ ইন্টারপার্সোনাল থেরাপি পরিবার, সঙ্গী এবং বন্ধুদের সাথে আপনার সম্পর্কের যে-কোনো সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং সমাধান করতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

আচরণগত সক্রিয়তা ঃ আচরণগত সক্রিয়তা আপনাকে আরও ইতিবাচক আচরণ বিকাশ করতে উৎসাহিত করে, যেমন বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা করা এবং গঠনমূলক কাজ করা যা আপনি সাধারণত করেন না।

কাপল থেরাপি (দম্পতিদের জন্য চিকিৎসা) ঃ আপনি যদি এমন একটি সম্পর্কের মধ্যে থাকেন যা আপনার মানসিক অবসাদকে প্রভাবিত করছে বলে মনে হয় তাহলে কাপল থেরাপি আপনার মানসিক অবসাদ ও সম্পর্কের যোগসূত্র বুঝতে সহায়তা করবে। এটি আপনাকে আপনার সঙ্গীর সাথে আরও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

কাউন্সেলিং ঃ প্রশিক্ষিত কাউন্সেলররা আপনাকে আপনার উপসর্গ ও সমস্যাগুলো বুঝতে এবং আপনাকে সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন।

সাইকোডায়নামিক সাইকোথেরাপি ঃ আপনার অতীত অভিজ্ঞতা আপনার বর্তমান জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে দেখাতে এই চিকিৎসা আপনাকে সাহায্য করে।

ডাক্তার বিদ্যাসাগর

দেবব্রত কবি (অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র সামাজিক স্তরের বিভিন্ন ব্যাধিগুলির চিকিৎসা করেননি। তিনি বিভিন্ন শারীরিক রোগ ব্যাধিরও চিকিৎসা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক সময়ে ভারতবর্ষে বিশেষ করে বাংলায় এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় বিশেষ প্রভাব থাকলেও বিদ্যাসাগর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমেই বহু মানুষের রোগব্যাধি দূর করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন ডাক্তারি ডিগ্রি করেননি অর্থাৎ বর্তমানকালের ভুয়ো চিকিৎসকের মতোই তার কোন ডিগ্রি ছিল না।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রথমিক ক্ষেত্রে প্রধান সম্বল ছিল শুধুমাত্র হ্যানিম্যানের ' Oraganon Of Medicine' বইটি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় হঠাৎ আকর্ষনের পেছনেও মূল কারণ ছিল যে— একসময় তার ছোট মেয়ের কঠিন রোগ সেরেছিল একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের চিকিৎসার ফলে। এছাড়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাঝে মধ্যেই মাথা ব্যাথা হত। যা থেকে তাকে উপশম দিয়েছিলেন বউবাজারের বাঙালি ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্ত। এরপর থেকেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপর তার আস্থা তৈরি হয় এবং সেখান থেকেই নিজে ঠিক করে নেন যে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিখবেন। তাই সাময়িকভাবে সুকিয়া স্ট্রিটের ডাক্তার চন্দ্রমোহন বোসের কাছ থেকে তিনি হোমিওপ্যাথি শিক্ষা নিতে থাকেন। তার সঙ্গে সঙ্গে শব ব্যাবচ্ছেদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে শেখার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছু নরকঙ্কাল সংগ্রহ করেন এবং বেশ কিছু হোমিওপ্যাথি বিষয়ে বই কিনে বানিয়ে ফেলেন আস্ত একখানা লাইব্রেরি।

১৮৬৬ সাল নাগাদ কলকাতায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বেরিনী সাহেব। অন্যদিকে এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে নাম ডাক মহেন্দ্রলাল সরকারের। একদিন কোলকাতায় অসুস্থ দ্বারকানাথ মিত্রকে দেখে একই গাড়িতে করে ফিরছিলেন তৎকালীন এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার ও সামান্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা জানা বিদ্যাসাগর মহাশয়। এইসময় -ই হোমিওপ্যাথি ও এ্যালোপ্যাথি কোন চিকিৎসা শ্রেষ্ঠ এ নিয়ে শুরু হয় দুজনের আলোচনা যা তর্কের আকারও গ্রহন করে। অবশেষে মহেন্দ্রলাল বিদ্যাসাগরের যুক্তি মেনে নেন। এরপর থেকে মহেন্দ্রলাল শুরু করেন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। কিছু দিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগরের প্রভাবে মহেন্দ্রলাল বাবুর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার প্রচার ও প্রসার এতই বৃদ্ধি পেল যে বেরিনী সাহেবকে চলে যেতে হয়েছিল কোলকাতা ছেড়ে।

ছোটবেলায় প্রাথমিক স্কুলে পড়েছিলাম এক কলেরা রোগীকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সেবা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। শুধু সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকেননি বিদ্যাসাগর। শহর কোলকাতায় যখন কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল সে সময় বহু কলেরা রোগীকে সমাজে অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছিল। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগর কখনো তার চিকিৎসক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে কখনো বা নিজে একাই চলে যেতেন তাদের কাছে এবং তার শুশ্রুষায় বহু কলেরা রোগী জীবনও ফিরে পেয়েছিলেন। শুধু কোলকাতায় নয় চিকিৎসার জন্য পৌঁছে

যেতেন অনেক গ্রামে। অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসুর লেখা থেকে জানতে পারি একবার বর্ধমানের বহুগ্রাম (উলে, দ্বারবাসিনী) কলেরা উজার হয়ে পড়লে বিদ্যাসাগর ওই সমস্ত গ্রামে ৬ মাস থেকে চিকিৎসা করেছিলেন।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত বিদ্যাসাগরের একটি ডাইরি থেকে জানা যায় তিনি রীতিমত ডাইরি মেনটেন করে চিকিৎসা করতেন। সেই ডাইরিতে দুটি এন্ট্রি লক্ষ্য করা যায় যেখানে স্ত্রী দিনময়ী দেবীর চিকিৎসা করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র। ডায়রিতে লেখা রয়েছে—

Dinamayi Devi

Thin watery evacuations cutting pains in the bowels - violent chills; Execessive heat an thirst-

15. 10. 80 Acontium 1 Every 2 hours

এছাড়াও পুত্রবধূ ভবসুন্দরীর চিকিৎসাও করেছেন নিপুনভাবে।

Bhabasundari

Copious, tenacious, yellowish discharge from the female genital organs.

26. 1 81 Aconitium 6 thrice daily

1. 2. 81 Sepea 30 thrice daily.

বিদ্যাসাগরের সহকর্মী ক্ষুদিরাম বসু লিখেছেন— 'আমার একবার পেটের ব্যায়রাম হয়েছিল, ব্রজেন বাঁড়ুয্যের প্রতাপ মজুমদারদের ঔষধেও ঠিক লাগছিল না, বিদ্যাসাগর মশায় আমায় দেখতে এসে বললেন'— থাকবে? — না যাবে? বেঁচে থাকতে চাও, না মরতে চাও? আমি একটু হাসলাম। তিনি বই খুঁজে খুঁজে আমাকে ঔষধ দিলেন—২/৩ বার খেয়েই সুস্থ হলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষুদিরাম কেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিখতে বলে বই আর ঔষধ মিলিয়ে দেড়শো টাকার একটা ফর্দ করে দেন। ক্ষুদিরামের কাছে সে সময় টাকা না থাকায় বিদ্যাসাগর তাকে ধার হিসেবে দেন। পরে ক্ষুদিরাম লিখেছিলেন আমি হোমিওপ্যাথি দিয়েই বাড়ির ছোটখাটো রোগ সারাই।

বিদ্যাসাগর মশায় যে একজন বড়ো মাপের ডাক্তার ছিলেন সেকথা জানা যায় তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের লেখা থেকে। ভাই শম্ভুচন্দ্র ছিলেন ডাক্তার বিদ্যাসাগরের অ্যাসিস্টেন্ট। শম্ভুচন্দ্র তার ডাইরিতে লিখেছেন 1871 খ্রীষ্টাব্দের May মাস থেকে 1874 খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত মোটামুটি স্থায়ীভাবে দাদা (বিদ্যাসাগর) ছিলেন সাঁওতাল পরগণার কার্মাটারে। এখানেই একটি বাড়ি কিনে বসবাস করতে থাকেন সহজ, সরল, সৎ, অকপট, অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত স্বচ্ছ কর্মঠ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন দাদা।

সহায় সম্বলহীন এই মানুষগুলির কাছে আত্মার আত্মীয় হয়ে যান বিদ্যাসাগর মশায়। এবং এদের চিকিৎসা পরিচর্যার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। এই সাঁওতাল এলাকায় তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ মারাং গুড়ু (প্রধান ঈশ্বর)। এখানকার সাঁওতালরা বিদ্যাসাগরকে বলতেন ডাকটর-বাবু বা ডাকটর-সাব। এছাড়াও কেউ বলতেন বাবা, কেউ বা জ্যাঠা কেউ বা কাকা। এখানে তাঁর বাড়ির বৈঠকখানাটি ছিল তাঁর চেম্বার, রোজ রোগী দেখতেন নিয়ম করে। ছুটির দিনেও, ভোরবেলা থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত, মাঝে কোন বিরতি ছিল না, চলত গ্রন্থ রচনার কাজ, গাছপালার পরিচর্যা আর রান্নাবাড়ার কাজ, তারপর বিকেল থেকে রোগীদের বাড়ি গিয়ে রোগী দেখা আর চিকিৎসা সংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজ খবর নেওয়া যা চলত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। রোগী দেখার সঙ্গে সঙ্গে দুধ- সাগু- বার্লি- চিনি- বাতাসা সহ প্রয়োজনীয় পথ্য ও দিতেন বিনে পয়সায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় রোগ পীড়িত মানুষের চিকিৎসা সেবা শুশ্রুসার প্রতি কতটা একাগ্র ছিলেন তাও আমরা লক্ষ্য করি শম্ভুচন্দ্রের আরও একটি লেখা থেকে যেখানে উল্লেখ রয়েছে— রাজনারায়ন বসু তখন দেওঘরে

অবস্থান করছেন। কথা ছিল বিদ্যাসাগর সেখানে যাবেন একটি বিশেষ কাজে কিন্তু যাওয়ার নির্দিষ্ট দিন কেটে গেল, তারপর ও দু-তিন দিন কেটে গেল। কোনও দিন কথার খেলাপ না করা এমন মানুষ যখন সেখানে গেলেন না তখন স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন হলেন রাজনারায়ন এবং পত্র মারফৎ তার উদ্বিগ্নতার কথা ব্যক্ত করলেন বিদ্যাসাগরকে, বিদ্যাসাগরও পত্র মারফৎ রাজনারায়ন বসুকে জানালেন যে— দুঃখ প্রকাশ করেই বলছি অশ্বিনী হেমব্রম (যার চিকিৎসা করছেন বিদ্যাসাগর) বছর ৬৪- র কলেরা রোগাক্রান্ত যমে মানুষে টানাটানি করা এর রোগীর চিকিৎসা পরিষেবায় দিনরাত ব্যাপৃত তাকে সুস্থ না করে যাওয়াটা বোধ করি সম্মত মনে করি না।

চিকিৎসা যেখানে আজ ব্যবসায় পরিণত সেখানে একজন আদর্শ চিকিৎসকের আদর্শ আচরণবিদের পাঠ নেওয়া যায় বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। ভোর থেকে বেলা দশটা চেম্বারে কেবল থিক থিক করা রোগীরা কালো-সাদা চুলের মাথাগুলি আর রোগ উপশম করে হাসিমুখে বাড়ি ফেরা, বিকেল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত রাউন্ডে যাওয়া রোগও রোগী পর্যবেক্ষন, ঔষধপত্র দিয়ে রোগীকে সারিয়ে তোলা, ডাক্তারের এই সাফল্য আজও প্রথাগত ডিগ্রিধারী ডাক্তারদের থেকে অনেক এগিয়ে।

''চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি জরা মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে, আর দেশের মানুষ চোখ বুঁজে 'ভগবান' 'ভগবান' করবে এমন ভগবৎ প্রেম আমার নেই। আমার ভগবান আছেন মাটির পৃথিবীতে। স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, বারবার যেন ফিরে আসি এই মর্ত্য বাংলায়।''

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব

বর্তমান যুবসমাজ

বিপ্লব পাহাড়ী (শিক্ষাকর্মী)

সমাজ হল এমন এক ব্যবস্থা, যেখানে একাধিক চরিত্র একত্রে কিছু নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করে একত্রে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে। মানুষের ক্ষেত্রেএকাধিক ব্যক্তি একত্র হয়ে লিখিত কিংবা অলিখিত নিয়ম-কানুন তৈরি করে; এরকম একত্র বসবাসের অবস্থাকে সমাজ বলে। যুবসমাজ বলতে বুঝায় কোনো নির্দিষ্ট স্থান, দেশ বা রাষ্ট্রের তরুণ প্রজন্মকে অন্যকথায়, সকল যুবকদের বুঝাতে যুবসমাজ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

যুবসমাজ হল একটি সমাজের চালিকাশক্তি। সমাজ পরিবর্তনের জন্য চাই গতি, শক্তি ও প্রগতি। আজকের তরুণরাই আগামী দিনের দেশ ও জাতির কর্ণধার। তরুণ অর্থাৎ যুবসমাজই পারে শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে দেশকে স্বপ্নের দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে। তাই সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় বলেছেন—

'পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।'

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যুবসমাজ এখন বিপথে পরিচালিত হচ্ছে। যুবসমাজের অবক্ষয়ের কারণে জাতি হতাশায় নিমজ্জিত। যুবসমাজের অবক্ষয় জাতির বুকে গভীর ক্ষত তৈরি করছে। গোটা সমাজকে ঠেলে দিচ্ছে অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে।

আজকের তরণেরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। কিন্তু অপসংস্কৃতি তাদের জীবনকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যুবসমাজ শুদ্ধ সংস্কৃতি সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত। তারা অসুন্দর ও কলুষিত সংস্কৃতি তথা অপসংস্কৃতির শিকার। যুবসমাজের একটা বড় অংশকে সুকৌশলে করা হয়েছে আদর্শভ্রষ্ট। সুন্দর জীবনের পথ থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অন্ধকার জীবনের পথে। তারা তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকার জগতে, অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে মাদকের নেশায়। বিপুল সংখ্যক তরুণের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে অস্ত্র, জড়িয়ে ফেলা হয়েছে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ডে। তারা লিপ্ত হচ্ছে অসামাজিক কাজে। হিংসাশ্রয়ী- অশ্লীল চলচ্চিত্র, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী বিকৃত রুচির নাচ- গান, রুচিগর্হিত পোশাক- পরিচ্ছদের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট ও অনুরক্ত করার গভীর নীলনকশা ধীরে ধীরে কার্যকর হচ্ছে।

পোশাক- পরিচ্ছদে আমাদের নিজস্ব একটি ঐতিহ্য ছিল। বিদেশি সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ও চর্চা আমাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক- পরিচ্ছদে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। জিন্স, টি-শার্ট, স্কার্ট এখন আমাদের ছেলেমেয়েদের খুবই প্রিয়। শাড়ি- ধুতি কিংবা পাজামা- পাঞ্জাবি এখন আর তাদের কাছে তেমন গুরুত্ব পায় না। আমাদের মেয়েদের অনেকেই স্বল্পবসনকে আধুনিক জীবনের নমুনা বলে ভুল করে। পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণের ফলে তারা একদিকে যেমন আধুনিক জীবনের ধারাকে ধরতে পারে না তেমনি দেশীয় সংস্কৃতির সাথেও নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে তারা একটি দোদুল্যমান অবস্থায় পতিত হয় অবশেষে জীবন হয়ে পড়ে লক্ষণহীন ও হতাশাপূর্ণ।

বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে যুবসমাজে খাদ্যাভ্যাসে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। কোনো খাবারের পুষ্টিমান বিবেচনা না করে টেলিভিশন চ্যানেলে খাবারের বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের নতুন প্রজন্ম তাতে আকৃষ্ট হচ্ছে। আমাদের সংস্কৃতির নতুন সংযোজন হচ্ছে ফাস্টফুড সংস্কৃতি। বর্তমানে তরুণ- তরুণীসহ শিশু-কিশোর এমনকি বয়স্কদের মাঝেও এ সংস্কৃতি চর্চা হচ্ছে। যা বাঙালির ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব খাবারগুলোকে ক্রমান্বয়ে অস্বীকার

করার প্রবণতা তৈরি করছে।

বিদেশি সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় জীবনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে চরমভাবে আঘাত করছে, সেটি হলো আমাদের ধর্মীয় জীবনবোধ ও নৈতিক শিক্ষা। পশ্চিমা ভোগবাদী সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচারের ফলে আমাদের যুবসমাজে ধর্মনিষ্ঠা এবং নৈতিকতা বোধ ক্রমহ্রাসমান। নারী- পুরুষের অবাধ মেলামেশা আর অ্যালকোহলিক সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতির পরিপন্থী। সুখী সুন্দর ও শান্তিময় জীবনের জন্য এসব কিছুর চেয়ে ধর্মীয় জীবনের নীতি অনুসরণ খুবই জরুরি। বিদেশি সংস্কৃতি আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে।

সোস্যাল মিডিয়া, ফেইসবুক, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ার খবরের প্রায় ৫০% খবরই সামাজিক অবক্ষয়ের। পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন, স্ত্রীর হাতে স্বামী খুন, প্রেমিকার হাতে প্রেমিক খুন, প্রেমিকের হাতে প্রেমিকা খুন, ভাইয়ের হাতে ভাই খুন, ছেলের হাতে মা খুন, পুত্রের হাতে পিতা খুন ইত্যাদি। আবার খুন, ধর্ষণ, গুমের খবরও কম নয়। বিশেষ করে শিশু ধর্ষণের খবর দেশের সর্বত্রই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ হচ্ছে, দেশের সর্বত্র মাদকের জয় জয়কার ধ্বনি। দেশে যে প্রান্তে থাকুক না কেন মাদক যুব সমাজকে গ্রাস করছে। মাদকাশক্ত ব্যক্তিরাই সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করছে। বিবাহ বন্ধনে কঠিনতম পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক, বিবাহ পূর্ব সম্পর্ক, বিবাহ পরে পরকীয়া, যথাসময়ে বিবাহ সম্পন্ন না হওয়া, একক সিদ্ধান্তে বিবাহ দেয়া ইত্যাদি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়ে গেছে যার কারণে সমাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও সম্পদের লোভ, ন্যায় বিচারের অনুপস্থিতি, সহশিক্ষা, নৈতিক শিক্ষার অভাব, নারীদের বৈচিত্র্যময়, উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ পোষাক সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেইস বুকের মাধ্যমে এই সামাজিক অবক্ষয় সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে যুবসমাজ আরোবেশী এ অবক্ষয়ে পা বাড়াচ্ছে। পর্ণোগ্রাফি, ভিডিওগ্রাফি ছাড়াও বর্তমান সময়ে কুরুচিপূর্ণ ভিডিও আপলোড করে ফেইসবুকে যা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে দেশে- বিদেশে। যুব সমাজের হাতের মুঠোয় আজ বিশ্ব। ডিজিটাল এ যুগে ফেইস বুক একাউন্ট প্রতিটি যুবকেরই আছে। ফেইসবুকে নগ্ন এসব ভিডিও দেখে তরুণ প্রজন্ম অবক্ষয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এসব ফুটেজগুলোতে অংশ নেয়া ছেলে- মেয়েরাও যেমন এ সমাজের অংশ, তেমনি যারা এর ক্রেতা তারাও এ সমাজেরই অংশ, এর সিংহভাগই আবার তরুণ প্রজন্ম। যারা স্বাধীনতার নামে আধুনিকতার দোহাই দিয়ে বেহায়াপনার শেষ সীমা অতিক্রম করে চলেছে নিত্য। আমরা জেনেও এর প্রতিকারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করে বরং তাদের সহযোগিতাই করে চলেছি দায়িত্বজ্ঞানহীন অপদার্থের মতো। যে ছেলেটি তার মোবাইলে এই ভিডিও ফুটেজগুলো দেখে রাস্তায় বের হয় তার কাছে সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া মেয়েটি আর ফুটেজে দেখা মেয়েটিকে একই মনে হবে এটাই স্বাভাবিক। আর তখন যে সে ওই মেয়েটিকে হেনস্তা করতে চাইবে; ইভটিজিং করবে এটাও কি স্বাভাবিক নয়? আমাদের নাটক- সিনেমার গানে তুমি- আমি ছাড়া কিছু নেই। মোবাইল কোম্পানিগুলো তাদের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সেটাকে উসকে দিচ্ছো আরও। ভাবখানা এমন, যেন বন্ধু পাশে থাকলেই হলো আর কারো প্রয়োজন নেই, বন্ধুত্ব মানেই প্রেম। প্রেমের জন্যই জীবন, আর প্রেম মানেই বেহায়াপনা। জীবনের আর কোনো লক্ষ্যই নেই! ঠিক একইভাবে ইন্টারনেট মানেই ফেসবুক, ফেসবুক মানেই ফেক আইডি আর মিথ্যের ছড়াছড়ি! বন্ধুত্ব- প্রলোভন, প্রেম অতঃপর বাস্তবতার ঘাড়ে রক্তাক্ত অন্তর।

এরপরে নেশা। বলে রাখা ভালো, ফেসবুকেও আছে জ্ঞানগর্ভ অনেক ভালো ভালো পাতা। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল তার পাঠক সংখ্যা নেহাতই নগণ্য। এইভাবে তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহারের ফলে যুবসমাজ অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে।

দেশের প্রতিটি পার্ক ও দর্শনীয় স্থানগুলোতে প্রেম বিনিময়, প্রেমিক প্রেমিকা জুটি বেঁধে প্রকাশ্য অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে বর্তমান যুবসমাজ। আবার আলো- আঁধারী কিছু হোটেল, মিনি চাইনিজ রেস্টুরেন্ট, সাইবার ক্যাফগুলোতেও অসামাজিক কার্যকলাপ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলছে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে ২৪ ঘন্টায় অসামাজিক কার্যকলাপ চললেও আইনের কোন প্রয়োগ নেই। দেশের অধিকাংশ বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে ইভটিজিং, নারীদের উত্যক্তকরণ, ধর্ষণের মতো ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সময়ে যে কোন পার্কের পরিবেশ এমনই যে সাধারণ মানুষ ইতস্ততবোধ করতে বাধ্য হয়। সংস্কৃতির আগ্রাসন ও অপসংস্কৃতির কারণেও সামাজিক অবক্ষয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে ভারতীয় চ্যানেল জি সিনেমা, স্টার প্লাস, স্টার জলসা, সি আই ডি ইত্যাদি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যা সম্প্রচার করা হয় তা থেকে সমাজের শেখার কিছুই নেই বরং বৌদির সাথে দেবরের সম্পর্ক, পরকীয়া, ননদ- বৌদির ঝগড়া, বউ- শাশুড়ীর অমিল, সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারা, আত্মীয়- স্বজনদের সাথে খারাপ আচরণ ইত্যাদি শিক্ষাই বেশী শিখছে। ফলে তা সমাজের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত।

কেন তরুণরা বিপথগামী হয় তার জবাব বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্নভাবে দেবার চেষ্টা করেছেন। তবে একটা বিষয় সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য তা হল, মানুষ আরাম- আয়েশপ্রিয় ও প্রবৃত্তির সেবক। তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। চার্বাক মতে, 'যাবং জীবং সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্তা ঘৃতং পীবেৎ'। অর্থাৎ যতদিন বাঁচো সুখে বাঁচো, ঋণ করে হলেও ঘি খাও। মানুষের মনে এ বাণীটি গেঁথে গেছে বলে মনে হয়। কারণ উল্লাস, আনন্দ, সুখ ভোগ ইত্যাদি জৈবিক প্রবৃত্তি মানুষকে অপরাধের দিকে নিয়ে যায়। আর যৌবন হল এই অপরাধ সংঘটনের প্রকৃষ্ট সময়।

তাই যুবসমাজকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা এখন ভাবার বিষয়। কারণ যুবসমাজের ওপর নির্ভর করছে দেশ। তারা অযোগ্য হয়ে উঠলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাদেরকে বাঁচানোর জন্য দরকার সুস্থ রাজনীতি, সমাজে স্থিতিশীলতা এবং নৈতিক শিক্ষা। কারণ সমাজ যদি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে এর কিছু অংশ সুস্থ থাকতে পারে না। অসুস্থের সঙ্গে থেকে অসুস্থ হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর এর প্রতিকারের জন্য দরকার প্রচারমাধ্যমগুলোর গঠনমূলক ভূমিকা, সুস্থ বিনোদন, ক্রীড়া ও শরীরচর্চা এবং আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন।
বর্তমান সরকার যুবসমাজের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন— যুব দিবস পালন, যুব মেলার আয়োজন ইত্যাদি। এ লক্ষ্যে যুব ক্রীড়া মন্ত্রনালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদফতর নিয়ে থাকে ব্যাপক কর্মসূচি। আমরা আমাদের যুবসমাজকে মেধা- মননে যোগ্য নাগরিক হিসেবে দেখতে চাই। তারা জাতি গড়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসে দেশকে চালিত করবে সঠিক পথে। আর এই পথ থেকে যেন বঞ্চিত না হয় যুবসমাজ, সেজন্য রাষ্ট্র ও বুদ্ধিজীবীদের সজাগ থাকতে হবে। তাই যুব সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সকলেরই এগিয়ে আসা উচিত। যুব সমাজ সচেতন হলে দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব হবে।

জল সংরক্ষণ

শুভজিৎ সামন্ত (হেড ক্লার্ক)

কয়েক বছর আগের কথা। উষ্ণায়নের ব্যাপারে সতর্ক না হলে জলের অভাবে ঘোর দুর্দিন সারা পৃথিবীর জন্য অপেক্ষা করছে, এমনই সাবধানবাণী শুনিয়েছিলেন পরিবেশবিদরা। তখন অনেকেই মনে মনে হেসেছিলেন।

এ-ও কী সম্ভব! যেখানে পৃথিবীর তিন ভাগই জল! তবে সেই কথা যে এত দ্রুত বাস্তবে পরিণত হবে, তা হয়তো অনেকে স্বপ্নেও ভাবেননি। বর্তমানে পৃথিবীর দুই ভাগের এক ভাগ মানুষ বছরে অন্তত তিন মাস জলকষ্টে ভুগছেন। গবেষকরা বলছেন, ২০৫০ সালের মধ্যে পৃথিবীর ৫০ শতাংশ মানুষ এই সঙ্কটের সম্মুখীন হবে। তার মধ্যে প্রথম সারিতে থাকবে এশিয়া আর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলি। এখনই কাতার, ইজরায়েল, লেবানন, ইরান, ভারত, পাকিস্তান-সহ ১৭টি দেশ তীব্র জল-সঙ্কটের সম্মুখীন। আরও ২৭টি দেশ সেই সঙ্কটের সীমানায় দাঁড়িয়ে।

জল-সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ উষ্ণায়ন। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য জলবায়ুর পরিবর্তন ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহল অনেক আগে থেকেই সচেতন। বিভিন্ন 'গ্রিনহাউস' গ্যাসের ক্ষতিকারক দিক এবং সেগুলির নির্গমন হ্রাস করার বিষয়ে শিল্পোন্নত দেশগুলিকে এ বিষয়ে অগ্রনী ভূমিকা নিতেও বলা হয়। কারণ, তারাই উষ্ণায়নের মূল ভাগীদার। কিন্তু উন্নত দেশগুলি একে অপরের দিকে দায় ঠেলে দিয়ে দায়মুক্ত হতেই ব্যস্ত। তাতে কাজের কাজ যে বিশেষ হয়নি, ক্রমাগত জলবায়ুর খামখেয়ালিপনাই তার প্রমাণ। ফলে, সারা ইউরোপ আজ চরম উষ্ণায়নের কবলে।

আমাদের দেশও প্রবলভাবে উষ্ণায়নে প্রভাবিত। একদিকে আমাদের রাজ্যের একাংশে যখন বৃষ্টির ঘাটতি চলছে, তখন আসাম, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র ভাসছে বন্যায়। বাংলাদেশ, মায়ানমার ,নেপালও বন্যার কবলে। আবার, পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ বন্যায় ভেসে গেলেও দক্ষিনবঙ্গে খরা পরিস্থিতি। ফলে, বিভিন্ন রাজ্যকে জলের অপচয় বন্ধ করতে মাথাপিছু জলের ব্যবহার বেঁধে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।

প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা আগেও ছিল। তবে এত প্রকট নয়। এর কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা মূলত 'গ্রিনহাউস' গ্যাসের প্রভাবে পরিবেশের উষ্ণতা বৃদ্ধিকেই দায়ী করছেন। উষ্ণায়নের কুপ্রভাবে বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর ক্রমপরিবর্তন ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছে জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক। এখনই 'গ্রিনহাউস' গ্যাস নির্গমনে রাশ টানা এবং একই সঙ্গে উৎপন্ন গ্যাস শোষণে উপযুক্ত ব্যবস্থা না করা হলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা।

পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অতটা খারাপ না হলেও চাষের প্রয়োজনীয় জল-সহ পানীয় জলের সঙ্কট ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। অনেক নদীতে জল নেই। কুয়ো, টিউবওয়েল, এমনকি, অনেক সাব-মার্সিবল পাম্পেও জল পাওয়া যাচ্ছে না। ভরসা বলতে মূলত খাল ও বড় বড় বাঁধের সামান্য জল। অনেক পরিবারকে এক-দেড় কিলোমিটার দূর থেকে সংগ্রহ করতে হয় পানীয় জল। আর চেন্নাইয়ে যে ধরনের জলসঙ্কট শুরু হয়েছে, আগামী দিনে এ রাজ্যে যে তেমন হবে না, কে বলতে পারে!

আশার কথা, আসন্ন বিপদের প্রেক্ষিতে সচেতনতায় উদ্যোগী হচ্ছেন মানুষজন। মিছিল-মিটিং চলছে। হচ্ছে সচেতনতা শিবির। গোটা রাজ্যে গত ১২ জুলাই 'সেভ ওয়াটার, সেভ লাইফ' দিবস পালিত হয়েছে। ১ আগষ্ট পালিত হয়েছে 'সেভ গ্রিন, স্টে ক্লিন' দিবসও। এছাড়া, ফি বছর ১৪-২০ জুলাই অরণ্য সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ চারাগাছ রোপণ করা হয়। এ বছরে জল-সঙ্কট ও খরা পরিস্থিতিতে সেইসব কার্যক্রম আরও বেশি করে চোখে পড়েছে।

৫ জুন 'আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস' থেকে চালু হয়েছে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি। বিভিন্ন ক্লাব, স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফে হাজার হাজার চারাগাছ বিলি হয়েছে, পোঁতাও হয়েছে। কিন্তু শুধু গাছ লাগালেই হবে না। সেগুলি যাতে ঠিকমতো পরিচর্যায় বেড়ে উঠতে পারে, সেদিকেও নজর দেওয়া দরকার।

বন দফতর চারা বিলি করে। ১০০ দিনের কাজে চারা তৈরি করে লাগানো হয়। এক বছর পরে, সেই চারার অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরি করলে জীবিত গাছের প্রকৃত হিসেব পাওয়া যেতে পারে। একই সঙ্গে অহেতুক বৃক্ষনিধন বন্ধ করতে হবে। বাঁকুড়া- পুরুলিয়ার বিস্তীর্ন জঙ্গলের দিকে তাকালে বোঝা যায়, কী ভাবে গাছ বিলুপ্ত হচ্ছে।

পাশাপাশি, বৃষ্টির জল সংরক্ষন ও বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য ছোট বড় জলাধারগুলির যথাযথ সংস্কারের ব্যবস্থা করা দরকার। বাড়াতে হবে জলের পুনর্ব্যবহার। 'ওয়াটার শেড' বা জল বিভাজিকার উন্নতি ঘটিয়ে জল ধরে রাখার ব্যবস্থার উন্নতি করার সঙ্গে সঙ্গে পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণ এবং তার সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে উষ্ণায়নের বিপদ কমানো যেতে পারে।

মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ মানুষের দেশ ভারতবর্ষে ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণ মাত্র চার শতাংশ। জল সংরক্ষণের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার কথা ভাবছে বলে জানা গিয়েছে। একই রকম প্রতিযোগিতার কথা ভাবা যেতে পারে জেলা, ব্লক, এমনকি, পঞ্চায়েত স্তরেও। তৃণমূল স্তর থেকে এই ধরনের প্রচেষ্টা সাফল্য পেলে তা সামগ্রিকভাবে জলসঙ্কট কাটাতে পারবে। আন্তর্জাতিক স্তরে 'গ্রিনহাউস' গ্যাসের নির্গমন কমাতে যেমন সহমতের ভিত্তিতে আইন করা দরকার, তেমনই জল সংরক্ষন, জলের অপচয় বন্ধ করা, গাছ লাগিয়ে তাকে যত্নে বড় করা— প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য হওয়া উচিত।

তোমাকে যে যাই বলুক চুপচাপ শুনে যাও কারণ জবাব তুমি নও সময় দেবে।

— গৌতমবুদ্ধ

Principal

DR. UMA GHOSH, (M.Sc. in Applied Mathematics, M. Phil, Ph. D)

Governing Body Member

2	SRI AMITAVA MAITY	President
1	DR. UMA GHOSH	Secretary & Principal
3	SRI NANIGOPAL ADAK	Govt. Nominee
4	MRS. MUNNA CHAKRABORTY(ROY)	Govt. Nominee
5	DR. NARAYAN CHANDRA MAITI	University Nominee
6	MS. DEBLINA HAZRA	University Nominee
7	DR.PRATYUS KUMAR JANA	Teaching Representative
8	DR.DEBANJAN MAITY	Teaching Representative
9	MR.TANMOY ROY	Teaching Representative
10	PROF. GOBINDA PRASAD KAR	Donor Member
11	MR.SUBHAJIT SAMANTA	Non-Teaching Representative
12	NOT AVAILABLE YET	WB State Council of Higher Education
13	NOT AVAILABLE YET	Students Representative

Teaching Staff

Deparment of Bengali

1. DR.PRATYUS KUMAR JANA (Asst. Prof &HOD) M. A, Ph.D.
2. MRS. SANGITA SAHU (SACT) M.A, B. Ed, M.Ed.
3. MRS. NAMITA MAITY (SACT) M.A.
4. MRS. ANUSRI MAITI DAS PATRA (SACT) M.A, B. ED, B.LIS.

Department of Sanskrit

1. DR.DEBANJAN MAITY (Asst. Prof &HOD) M.A, Ph.D.
2. MR. AMIT PAKHIRA (SACT) M.A, B. Ed, M.Ed.
3. MR. KRISHNAPADA PAUL (SACT), M.A, B. Ed, M.Ed.
4. MRS. ARPITA CHAKRABORTY (SACT) M.A, B. Ed.
5. MRS. PAMELI MONDAL (SACT) M.A, B. Ed.

Department of English

1. MR. RADHANATH MAHAPATRA(SACT &HOD) M.A, B. Ed.

2. MR. CHIRADIP BERA, (SACT) M.A, B. Ed.
3. MR. SANJIB DOLAI (SACT) M.A, B. Ed.
4. MR. MRINMOY MUKHERJEE (SACT) M.A,B. Ed.

Department of Philosophy

1. MRS. DIPANWITA GHANA(SACT &HOD) M. A, B. Ed.
2. MRS. MAITRAYEE PARUI (SACT) M.A, B. Ed.
3. MR. ANANDA PAHARI (SACT) M.A, B. Ed, M. Phil.
4. MR. PALASH BHUNIA (SACT) M.A.

Department of Education

1. DR.SHYAMASREE SUR, (Asst. Prof &HOD) M. A, M.Ed, M. Phil, Ph. D.
2. MRS. MOUMITA MAITY (SACT) M.A, B. Ed.
3. MR. DEBASIS SASMAL (SACT) M.A, B. Ed.
4. SK. MOJAMMAL HOSSAIN (SACT) M.A, B. Ed.

Department of History

1. MR. TANMOY ROY (Asst. Prof &HOD)M.A, B. Ed.
2. MR. DEBABRATA KABI (SACT) M.A, B. Ed, M.Ed.
3. DR.PRASENJIT NAYEK (SACT)M.A, B. Ed. Ph.D.

Department of Physical Education

1. DR. PRASANTA KUMAR BHUNIA (HOD)M.P.Ed, Ph. D.
2. MR. HARISADHAN PORIA (SACT) M.P.Ed.
3. MR. KARTIK DOLAI (Laboratory Attendant) M.P

Department of Geography

1. MR. ABU KALAM ALBERUNI (Asst. Prof &HOD) M.Sc, B. Ed, M.Ed.
2. MR. SUMAN PAUL (SACT) M.Sc, B. Ed, M. Phil.
3. MR. TARAKNATH SAU (SACT) M.A, B. Ed.
4. MR. RASHBEHARI KAR (Laboratory Attendant) B.A.

Department of Physics

1. MR. PABITRA ADHIKARY (SACT&HOD) M.Sc, B.Ed.

Department of Chemistry

1. MR. PORNAB DOLAI(SACT &HOD) M.Sc, B.Ed.

Department of Mathematics

1. MR. JAHEDUL MOLLICK, (SACT &HOD) M.Sc, B.Ed.

Department of Zoology

1. MR. PABITRA GOSWAMI(SACT &HOD) M.Sc, B.Ed.

Library

1. Dr. SUDIPTA PRADHAN, Librarian, M.Sc, M.LIS, Ph. D.
2. MR. BIPLAB PAHARI, (Library Clerk) M. A, B.Ed, B.LIS.
3. MR. RAJKUMAR SAMANTA (Library Peon) B.A.

OFFICE STAFF

1. MR. SUBHAJIT SAMANTA (Head Clerk) M. A, B.Ed, M.Ed.
2. MR. SUJIT KUMAR MAITY (Accountant) B.Sc.
3. MR. SURAJIT MANNA (Cashier) B.A.
4. MR. SABYASACHI MAITY(L D Clerk) H.S.
5. MR. PRASANTA KUMAR GHORAI (L D Clerk) H.S.
6. MR. SANTI GOPAL MAITY (Guard) M.A.
7. MR. DIBAKAR GHORAI(Guard) M.A.
8. MR. TARAKNATH DOLAI(Peon) B.A.
9. MRS BULTI BAR (Peon) M.A.
10. MRS. SABINA KHATUN (Lady Attendant) M.A, B.Ed.
11. MR. RAJSHANKAR BHUNIA (Karmabandhu) M.P